দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

আল-কুরআন আর্কাইভ-২০১৯

দাওয়াহ ইলাল্লাহ ফোরামের

নির্বাচিত পোস্ট সমগ্র

২০১৯ ঈসায়ী

সূচিপত্র

কুরআন এক মহা নিয়ামত – এর থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হয়ে যাই!৪

দরসুল কুরআন; রমযান; তাকওয়া অর্জনের প্রশিক্ষণশালা ১৪

কুরআন অনুধাবন (লেকচার ও প্রশ্ন-উত্তর পর্ব) ১৮

আকাবিরের বাণী : কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত ও তাদাব্বুর ৪৩

তাবলিগ প্রসঙ্গ (এক) ৪৯

দরসুল কুরআনঃ রমযানে বেশি বেশি ইবাদতের মাধ্যমে জিহাদের ইমানের প্রস্তুতি গ্রহণ করি।.....৫৪

কোরআনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ৫৮

তাদাব্বুরে কুরআন! ৬২

হে প্রিয়বন্ধু তোমাকেই বলছি! (তিন) ১১১

কুরআন: কখনও ভেবে দেখেছি? ১১৬

কুরআন এক মহা নিয়ামত – এর থেকে আমরা যেন বঞ্চিত না হয়ে যাই!

s_forayeji

Moderator

০১-০৪-২০১৯

বিসমিল্লাহ , ওয়াস সালাতু আস সালামু আলা রাসুলিল্লাহ

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা আমাদের কে এক বিশাল বড় নিয়ামত দান করেছেন - সেটা হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা বলেন –

يَاأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ

হে মানব সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে উপদেশবানী এসেছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে এবং অন্তরের রোগের নিরাময়, হেদায়েত ও রহমত মুসলমানদের জন্য।

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা আরো বলেন –

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা নিজে কুরআনের অনেক জায়গায় কুরআনের ব্যাপারে প্রসংশা করেছেন।

আল্লাহ বলেছেন এই কুরআন হচ্ছে –

هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

এটা মানুষের জন্যে জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হেদায়েত ও রহমত। (সুরা জাসিয়া - ২০)

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ

এতে এবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (সুরা আম্বিয়া - ১০৬)

لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

আমি তোমাদের প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি; এতে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না? (সুরা আম্বিয়া - ১০)

এরকম আরো অনেক! প্রশ্ন হচ্ছে - আমরা কুরআন থেকে কতটুকু ফায়দা নিতে পারছি? কুরআনের ভিতরে আল্লাহ আমাদের জন্য সমস্ত সমস্যার সমাধান রেখেছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা সেই সমাধানের কতটুকু নিতে পারছি? কুরআন শুধু আমাদের ধর্মীয় জীবন নিয়ে কথা বলেনি, বরং এর বাইরে ব্যাক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, সমরনীতি, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস, চিকিৎসা সমস্ত কিছু ব্যাপারে কথা বলেছে। কুরআন যেমন বাদ দেয়নি মহাকাশ এর মত বিশাল বিষয়বস্তু তেমনি বাদ দেয়নি অনু পরমানুর মত সূক্ষ বিষয়বস্তু। কুরআন যেমন দুনিয়ার জীবনকে বর্ণনা করেছে তেমনি বর্ণনা করেছে আখিরাতের জীবন। কুরআন যেমন আমাদের সূচনা বর্ণনা করেছে, তেমনি করেছে এই সৃষ্টি জগতের, তেমনি করেছে অন্য মাখলুকের। **এতে যেমন সমাধান আছে তেমনি আছে চ্যালেঞ্জ**। এতে যেমন ভয় আছে তেমনি ভালোবাসা আছে।

আমার মত অধমের জন্য কুরআনের ব্যাপারে বর্ণনা করার চেষ্টা করা হাস্যকর ।

আল্লাহ কুরআনের ব্যাপারে কেমন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন দেখেন –

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

তারা কি বলে? কোরআন তুমি তৈরী করেছ? তুমি বল, তবে তোমরাও অনুরূপ দশটি সূরা তৈরী করে নিয়ে আস এবং আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডেকে নাও, যদি তোমাদের কথা সত্য হয়ে থাকে। (হুদ - ১৩)

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

মানুষ কি বলে যে, এটি বানিয়ে এনেছ? বলে দাও, তোমরা নিয়ে এসো একটিই সূরা, আর ডেকে নাও, যাদেরকে নিতে সক্ষম হও আল্লাহ ব্যতীত, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (ইউনুস - ৩৮)

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, তাহলে এর মত একটি সূরা রচনা করে নিয়ে এস। তোমাদের সেসব সাহায্যকারীদেরকে সঙ্গে নাও-এক আল্লাহকে ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। (বাকারা - ২৩)

আজ পর্যন্ত কি কেউ পেরেছে? কেউ? দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে। সারা দুনিয়ায় মানুষ কত কি করে দেখাচ্ছে? কেন তারা একটা সুরা বানিয়ে দেখাতে পারলোনা! আল্লাহ নাজিল করলেন সুরা বুরুজ এর প্রথম আয়াত - ওয়াস সামা ইজা তিল বুরুজ। রাসুল সাঃ এই আয়াত কে কাবার দরজায় ঝুলিয়ে দিতে বললেন আর মক্কার কাফের কবিদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন - যাও পারলে এই আয়াতের পরের আয়াত নিয়ে আসো। মক্কার কাফেররা পেরেশান হয়ে গেলো, ওয়াস সামা ইজা তিল বুরুজ - ওয়াস সামা ইজা তিল বুরুজ ... এর পরে কি হবে! কোন কিছুই বের করতে পারেনা। সব শেষে তাদের সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ কবি নিয়ে আসলো -<< ওয়াস সামা ইজা তিল বুরুজ >> // ওয়ান নিসা ইজা তিল ফুরুজ! // - এর পরে আল্লাহর আয়াত আসলো

ওয়াস সামা ইজা তিল বুরুজ .ওয়া ইয়াওমিল মাওউদ. ওশাহিদিও ওয়া মাশহুদ ...

মক্কার কাফেররা পর্যন্ত তাদের কবিকে বললো - **তুমি এইটা কি লাইন নিয়ে তৈরি করলা! তোমার জন্য লজ্জা ছাড়া আর কিছুই না!!!** এরকম আরও আছে - মিথ্যা নবি মুসায়লামা ও কুরআনের অনুকরনে সুরা বানানোর চেস্টা করেছিলো - যা হাস্যরস ছাড়া আর কিছুই না।

এই উদাহরন আমি এই জন্য পেশ করলাম যেন - এতদিন আমরা শুনে এসেছি এই কুরআনের মত আরেক টা সুরা কেউ বানাতে পারেনি, পারবে না। কিন্তু কেন? আমাদের জানতে হবে কেন পারবে না? এটা না জানলে এই বেপারে আমাদের ইয়াকিন আসা হয়ত কঠিন হতে পারে। এমন না যে কেউ চেষ্টা করেনি! করেছে আপ্রান চেষ্টা করেছে। আরবের বিখ্যাত বিখ্যাত কবিরা আপ্রান চেষ্টা করেছে কিন্তু তারা মুসায়লামার সুরা তুফা এর অপেক্ষা উত্তম কিছু আনতে পারেনি! জি পারেনি - স্রেফ পারেনি। আর এটাও মনে রাখা দরকার মুসায়লামার আরবি যেন তেন কিছু ছিলনা, সেই যুগে আরবদের মধ্যে সম্মানিত হতে হলে তার আবশ্যিক যোগ্যতার মধ্যে একটি হচ্ছে আরবি সাহিত্য/ভাষার উপরে দক্ষতা। কারন আরবরা তাদের সাহিত্য এবং ভাষা নিয়ে গর্বিত ছিল!

আর আর কোন দিন পারবেও না। কারন সাহিত্যবিদ দের মতে - কুরআন এর যে আরবি এই আরবি এখন আর নেই - এই আরবির পারদর্শিতা এখন আর কারো নেই!

যাই হোক - এটা আমার মূল কথা ছিলোনা। আমি যা বলতে চাচ্ছিলাম তা আসলে অন্য প্রসঙ্গ। তবে এই কথাগুলো এজন্য বললাম যেন কুরআন সম্পর্কে আমাদের সামনে যেন কিছু তথ্য হাজির থাকে।

মূল কথাঃ

মূল কথায় যাবার আগে একটা ঘটনা বলি। ডক্টর মরিস বুকাইল এর নাম তো আপনারা অনেকে শুনেছেন। তাকে ফিরাউনের মমি পরীক্ষা করার জন্য প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছিলো। ডক্টর মরিস গবেষণা থেকে যা পেলেন তা হচ্ছে - ফিরাউনের দেহ সাগরে ডুবেছিলো। এবং তার অনুসারীরা সাগর থেকে ফিরাউনের দেহ তুলে নিয়ে এসে মমি করে। ডক্টর মরিসের মনে যে প্রশ্ন ছিলো তা হচ্ছে - সাগর থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা এই শরীরকে কিভাবে মমি করা গেলো! আর করা হলেও কিভাবে তা এতদিন পর্যন্ত টিকে থাকলো! কারন - পানিতে ডুবে

গেছে এমন দেহ মমি করে সংরক্ষন করা অসাধ্য! **ইতিমধ্যে ডক্টর মরিস কোন ভাবে জানতে পারলেন যে কুরআনে এই কথা ১৪০০ বছর আগেই উল্লেখ করা আছে - আল্লাহ বলেছেন - তিনি ফিরাউনের দেহকে সংরক্ষন করবেন যেন তা মানব জাতির জন্য নিদর্শন হতে পারে! ডক্টর মরিস এই কথা শুনে - কোন ভাবেই বিশ্বাস করতে চান নি, এর পরে তিনি নিজে কুরআন খুলে এর সত্যতা যাচাই করেন এবং মুসলমান হয়ে যান!**

এরকম ঘটনা এক, দুই টা নয় বরং অনেক রয়েছে। তাহলে আমরা কেন কুরআন থেকে উপকৃত হতে পারছিনা? আমরা কেন কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারছিনা? বিধর্মীরা এই কুরআন নিয়ে গবেষণা করে এর থেকে উপকৃত হচ্ছে, কুরআনের বিজ্ঞান, কুরআনের সাহিত্য, কুরআনের সৌন্দর্য অনুভব করছে কিন্তু কেন আমরা অধিকাংশ মুসলিম এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি? কেন কুরআনের দ্বারা আমাদের জিন্দেগীতে কোন প্রভাব তৈরি হয়না? অথচ আমরাই সর্বপ্রথম এই কিতাবের থেকে উপকৃত হবার হক্কদার ছিলাম।

সাহাবাগন তাদের জিন্দেগীর সাথে কুরআন কে এক করে নিয়েছিলেন। তাদের জিন্দেগী আর কুরআন আলাদা কিছু ছিলোনা। কিন্তু আমরা আজ আমাদের জিন্দেগী থেকে কুরআন কে আলাদা করে ফেলেছি। আর এটাই কাফেরদের সফলতা যে তারা আমাদেরকে কুরআন থেকে আলাদা করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একবার এক মন্ত্রী কুরআন হাতে নিয়ে বলেছিলো যতদিন মুসলিমরা এই কুরআন কে ধরে রাখবে - তোমরা তাদেরকে শাসন করার কথা ভুলে যাও। আর এভাবে যখন আমরা কুরআন থেকে আলাদা হয়ে গেলাম তখনই আমরা অন্ধ দিশেহারা জাতিতে পরিনত হয়েছি আর জালিমরা আমাদের উপরে চেপে বসতে সক্ষম হয়েছে।

আল্লাহ সুরা হাদিদে - এমন কথাই বলেছেন –

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

যারা মুমিন, তাদের জন্যে কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মত যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। তাদের উপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী। (হাদিদ - ১৬)

কুরআন থেকে দূরে সরে গেলে আমাদের হাল কি হতে পারে সে ব্যাপারে আল্লাহ আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে কুরআন থেকে অনেক অনেক দূরে সরে গেছি!

যে কোন ভাবেই হোক সাধারন ভাবে আমাদের মধ্যে ধারনা হয়ে গেছে - কুরআন শুধু তিলাওয়াত করার জন্য। কিন্তু এ কথা কে বলেছে? আল্লাহ বলেছেন? রাসুল সঃ বলেছেন? সাহাবারা এমন কিছু করেছেন? তাহলে আমাদের মনে এমন ধারনা কে দিলো? কেন আমরা কুরআনের ব্যাপারে এত সংকীর্ণ হয়ে গেলাম! কুরআন হচ্ছে হিদায়েতের জন্য, রহমতের জন্য, শিফা'র জন্য। আমি বা আপনি যদি কুরআন কে নাই ই বুঝি তাহলে কিভাবে এর রহমত, হেদায়েত, শিফা আশা করতে পারি? যে হার্টের ডাক্তার সার্জারির বই এ কি লেখা আছে তাই বুঝেনা সে কিভাবে হার্টের চিকিৎসা করবে! তাহলে জাতি হিসেবে আমরা যদি কুরআন কে বুঝতে ব্যর্থ হই তাহলে এটাই নিশ্চিত যে - আমরা হেদায়েত, রহমত, শিফা, বিজ্ঞান এগুলো সব কিছু থেকে বঞ্চিত হব। আর বাস্তবেও হচ্ছি।

হায়, মুসলিম তো আজ কুরআন কে বিজ্ঞানময় ভাবতেই লজ্জা পায়! আল্লাহ বলছেন - ইয়া সিন, ওয়াল কুরআনিল হাকিম। (প্রজ্ঞাময় কোরআনের কসম)। মরিস বুকাইল এর কথা - কুরআন বিজ্ঞানের যা কিছু উল্লেখ করেছে তার সবই সত্য, তবে কুরআনের মধ্যে এমন আরো অনেক কিছুই আছে যা এখনো বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে!

তাহলে কেন আমরা এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি? নিচে আমি আমার খেয়াল থেকে কিছু কারন উল্লেখ করছি এ ব্যাপারে যা আমাদের সাথে কুরআনের দূরত্ব কমানোর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

১। আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গি। কুরআনের দিকে আমাদের যেভাবে তাকানো দরকার আমরা সেভাবে তাকাইনা। আমাদের মনে কুরআনের ব্যাপারে যে বদ্ধমূল ধারনা

রয়ে গেছে সেটা নিয়েই আমরা টিকে আছি। কুরআনের সর্বোচ্চ ব্যাবহার শুধু তিলাওয়াত, কিছু সুরা মুখস্ত। আর এটা সম্ভবত আমরা আমাদের বাবা মা পরিবার সমাজ থেকেই শিখেছি। কিন্তু দ্বীন শেখার উৎস পরিবার নয়! এটাও একটা সমস্যা যে - দ্বীন কোথা থেকে শিখতে হবে কার থেকে শিখতে হবে এটা পর্যন্ত কেউ আমাদের শিক্ষা দেয়না!

২। কুরআনের ব্যাপারে ইয়াকিনের অভাব। আল্লাহ যে কুরআন কে হেদায়েত, রহমত, শিফা হিসেবে নাজিল করেছেন, কুরআন যে সত্যই শিফা - এই ব্যাপারে আমাদের ইয়াকিন এর অভাব আছে। আরে ভাই আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই কুরআন দিয়ে শিফার প্রয়োগ দেখিয়েছেন। আমরা পারিনা এটা আমাদের ব্যর্থতা, কুরআনের নয়! এই কুরআন প্রতিনিয়ত মানুষ কে হেদায়েতের পথ দেখাচ্ছে!

আল্লাহ বলেন –

الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ

যা তোমার পালকর্তা বলেন তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। কাজেই তোমরা সংশয়বাদী হয়ো না। (আল ইমরান - ৬০)

আল্লাহ আরো বলেন –

الر ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ ۗ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। (রাদ - ১)

৩। কুরআনের সাথে সংশ্লিষ্টতার অভাব। কুরআনের সাথে আমাদের সময় খুব কম কাটে। খুব সম্ভব কুরআন কে আমরা সবচেয়ে কম সময় দেই! অথচ উমার রাঃ ১০ বছরের ও অধিক সময় দিয়েছিলেন শুধু সুরা বাকারা মুখস্ত করার জন্য। আমরা দুনিয়ার যে কোন সস্তা কিছুর জন্য সময় ব্যায় করতে কার্পণ্য করিনা কিন্তু কুরআনের সাথে আমাদের কোন সময় দেয়া হয়না। রমাদান ব্যাতিত হয়ত কুরআনের সাথে আমাদের কোন সম্পর্কই থাকেনা।

৪। শিক্ষার অভাব। খোদ কুরআনের ব্যাপারেই আমাদের শিক্ষার অভাব। কুরআন কি বলেছে এই বুঝ তো অনেক পরের কথা, শুদ্ধ ভাবে তিলাওয়াত পর্যন্ত আমরা করতে পারিনা। কিন্তু এর চেয়েও যা দুঃখজনক তা হচ্ছে এই ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ দেখা যায়না! হায় আমি কত দুর্বল কুরআন শিক্ষার জরুরত আপনাদের সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে! আরে ভাই - এটা কুরআন - কুরআন। একবার এটার দিকে ফিরে তাকান। এটা আপনার রব্ব এর কালাম! দুনিয়ার সমস্ত কিছু শেখার ব্যাপারে আমাদের সময় হয় কিন্তু কুরআন শেখার জন্য আমাদের সময় হয়না!

আল্লাহ বলেন –

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসেবে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসূহ লক্ষ্য করে এবং বুদ্ধিমানগণ যেন তা অনুধাবন করে। (স্বদ - ২৯)

৫। প্রয়োগ এর অভাব। যাদের জন্য কুরআন এর শিক্ষা, কুরআনের বুঝ সহজ করে দিয়েছেন তারা সামান্য দুনিয়ার স্বার্থে এই কুরআনের শিক্ষা কে আমল পর্যন্ত নিয়ে আসেনা। কুরআন কোন তত্ত্ব কথা না। বা আগের দিনের গল্পকথা ও না। কুরআন হচ্ছে এমন যার প্রতিটি কথা জীবন্ত! এর নাজিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব জাতির মুক্তির জন্য। তাহলে কেমন করে কুরআন বাস্তব প্রয়োগ ব্যাতিত থাকতে পারে! কিন্তু যে মানবেনা যে - কুরআন মানব জাতির মুক্তির দিশারী তার কথা ভিন্ন! আফসোস আমরা অনেকে মুসলিম হয়েও এটি মানতে পারিনা! অনেকে তো দুনিয়ার জন্য - কুরআনের শিক্ষাকে বিক্রি করে দেয়। খুব সামান্য স্বার্থের বিনিময়ে! আল্লাহ তাদের ব্যাপারেও বলেছেন –

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায়

না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে, বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (বাকারা - ১৭৪)

وَلَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ

এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব। অতএব, তারা দোযখের উপর কেমন ধৈর্য্য ধারণকারী। (বাকারা - ১৭৫)

অধিক অনাচারী কে হবে, যে আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে এবং গা বাঁচিয়ে চলে। অতি সত্ত্বর আমি তাদেরকে শাস্তি দেব। যারা আমার আয়াত সমূহ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে-জঘন্য শাস্তি তাদের গা বাঁচানোর কারণে। (আনয়াম - ৫৭)

৬। তাফাক্কুর এর অভাব। আমরা কুরআন এর ব্যাপারে তাফাক্কুর/তাদাব্বুর করিনা। এটা নিয়ে চিন্তা গবেষণা করিনা। দুখের কথা অনেক বিধর্মী যেটা করে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহুওতায়ালা এই কুরআনের মধ্যে যে কত কি রেখেছেন কোন দিনও আমরা তা খুজে পাবোনা যদি না আমরা কুরআন নিয়ে চিন্তা গবেষণা না করি।

আল্লাহ বলেন –

إِنَّ فِي هَٰذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ

এতে এবাদতকারী সম্প্রদায়ের জন্যে পর্যাপ্ত বিষয়বস্তু আছে। (আম্বিয়া - ১০৬)

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

আমি এ কোরআনে মানুষের জন্যে সব দৃষ্টান্তই বর্ণনা করেছি, যাতে তারা অনুধাবন করে (ঝুমার - ২৭)

এই কুরআনের মধ্যেই আমাদের জন্য সফলতা আছে। আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করতে হলেও তা এই কুরআন এর সাহায্যেই করতে হবে। আপনি আল্লাহ কে ভালোবাসতে চান? তাহলে তার আগে আমাকে আপনাকে কুরআন কে ভালোবাসতে হবে। আপনি আল্লাহ সম্পর্কে না জানলে আল্লাহ কে ভালোবাসবেন

কিভাবে? আর কুরআন ব্যাতিত অন্য কি এমন আছে যা আপনাকে আল্লাহর ব্যাপারে জানাতে পারে?

এই কুরআন ই আমাদের জন্য সবকিছু, মানব জাতির জন্য মুক্তির দিশা। কুরআন ই আমাদের জীবন বিধান, আমাদের সংবিধান। যে কেউ এই কুরআন থেকে বঞ্চিত হল সে তো সমস্ত নিয়ামত থেকেই বঞ্চিত হল, আর যে কেউ এই কুরআন এর স্বাদ আস্বাদন করতে পারলো সে যেন সফল হয়ে গেল!

ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের জন্য আপনার কিতাব কে সহজ করে দেন আর কুরআনের বুঝ কে আমাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।

আল্লাহ বলেন –

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ۗ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে, এ কোরআন সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? (হা মিম - ৫৩)

পরিশেষে –

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

এগুলো হলো আল্লাহর নিদর্শন, যা আমরা তোমাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে থাকি। আর আপনি নিশ্চিতই আমার রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। (বাকারা – ২৫২)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১১৯৬৭

দরসুল কুরআন; রমযান; তাকওয়া অর্জনের প্রশিক্ষণশালা

আদনানমারুফ

Senior Member

০৫-১৪-২০১৯

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

হে ইমানদারগণ, তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরয করা হয়েছিল, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো, গুনাহ হতে বেঁচে থাকতে পারো। সুরা বাকারা, আয়াত, ১৮৩

এখানে স্বভাবতই প্রশ্ন হয়, রোযা রাখার দ্বারা কিভাবে তাকওয়া হাসিল হবে? এর উত্তরে আলেমগণ বলেন, রমযানে রোযাদার হালাল চাহিদা পূরণ করা হতে বিরত থাকার মাধ্যমে হারাম থেকে বেঁচে থাকার যোগ্যতা অর্জন করে। দেখুন, পানাহার ও স্ত্রী সহবাস তো বৈধ চাহিদা, কিন্তু রোযা রাখলে এগুলো থেকে বিরত থাকতে হচ্ছে। সুতরাং যে রোযা রেখে বৈধ চাহিদা হতে বিরত থাকতে পারবে, সে কেন অবৈধ চাহিদা ও গুনাহের কাজ হতে বিরত থাকতে পারবে না? হাঁ, তবে যে ব্যক্তি রোযা রেখেও বিভিন্ন গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়, রোযা তার জন্য তাকওয়ার প্রশিক্ষণ কিভাবে হবে? এজন্যই হাদিসে রোযা রেখে ঝগড়া-বিবাদ না করা, গীবত না করা এবং সকল প্রকার গুনাহের কাজ হতে বেঁচে থাকার তাগীদ এসেছে এবং বলা হয়েছে, যারা রোযা রেখে গুনাহের কাজে লিপ্ত হয় তাদের রোযা দ্বারা উপবাস ব্যতীত কোন ফায়দা নেই।

»الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابَّه أحد أو قاتله، فليقل إني امرؤ صائم«. صحيح البخاري: (1904) صحيح مسلم: (1151)

রোযা ঢালস্বরুপ, সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রোযা রাখে তখন যেন সে অশ্লীল কথা না বলে, ঝগড়াঝাটি না করে, যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে

ঝগড়া করতে উদ্যত হয় তাহলে সে তাকে বলবে, আমি রোযাদার, (আমি তোমার সাথে ঝগড়া করতে চাই না) -সহিহ বুখারী, ১৯০৪ সহিহ মুসলিম, ১১৫১

হাদিসের ব্যাখায় হাফেয ইবনে হাযার রহিমাহুল্লাহ (মৃ: ৮৫২ হি.) বলেন,

ولأحمد من طريق أبي يونس عن أبي هريرة» :جنة وحصن حصين من النار». وله من حديث أبي عبيدة ابن الجراح: «الصيام جنة ما لم يخرقها» زاد الدارمي «يعني بالغيبة» وبذلك ترجم له هو و أبو داود، ...وقال القرطبي: جنة أي سترة، يعني بحسب مشروعيته، فينبغي للصائم أن يصونه مما يفسده وينقص ثو ابه، وإليه الإشارة بقوله: «فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث» الخ، ويصح أن يراد أنه ستره بحسب فائدته وهو إضعاف شهوات النفس، وإليه الإشارة بقوله: «يدع شهوته الخ»... وقال عياض في الإكمال: معناه :سترة من الآثام أو من النار أو من جميع ذلك، وبالأخير جزم النووي. (فتح الباري: 104/4 ط. دار الفكر(

... মুসনাদে আহমদে আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহর সূত্রে বর্ণিত হাদিসে এসেছে, রোযা ঢালস্বরুপ, যতক্ষন পর্যান্ত তাকে (গীবতের মাধ্যমে) ছিদ্র করা না হয়। ... রোযাকে ঢাল বলা হয়েছে, রোযার ফায়দার দিকে লক্ষ্য করে, কেননা রোযার দ্বারা (গুনাহের প্রতি) অন্তরের শাহওয়াত কমে যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 'রোযাদার আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের শাহওয়াত ছেড়ে দেয়' এ কথায় এ দিকেই ইশারা করা হয়েছে। -ফাতহুল বারী, ৪/১০৪

عن أبي هريرة ﷺ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشر ابه». صحيح البخاري: (1903 (

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع.«

আবু হুরাইরা রাযিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখেও মিথ্যা কথা বললো, গুনাহে লিপ্ত হলো, তার পানাহার পরিত্যাগ করাতে আল্লাহর কোন গরজ নেই। সহিহ বুখারী, ১৯০৩

অন্য বর্ণণায় এসেছে, কোন কোন রোযাদার উপবাস ব্যতীত তার রোযা দ্বারা কিছুই অর্জন করতে পারে না। সুনানে ইবনে মাজাহ, ১৬৯০

عن إبراهيم، قال: كانوا يقولون: «الكذب يفطر الصائم». (مصنف ابن أبي شيبة: 8981)

عن كعب و أبي العالية، قالا: «الصائم في عبادة ما لم يغتب». (مصنف ابن أبي شيبة: 8982 ومصنف عبد الرزاق: 7896)

ইবরাহীম নাখায়ী বলেন, সালাফ বলতেন, মিথ্যা কথার দ্বারা রোযা ভেঙ্গে যায়।

মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৮৯৮১

তাবেয়ী কাবে আহবার ও আবুল আলিয়া বলেন, রোযাদার যতক্ষণ পর্যন্ত গীবত না করে ততক্ষণ সে ইবাদতে থাকে। মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, ৮৯৮২ মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৭৮৯৬

বস্তুত, রমযানে একদিকে শয়তান বন্দী, অপরদিকে রোযার কারণে নফসও দূর্বল হয়ে যায়, তাই এ মাসে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য মাসের সহজ, তাই এ মাস তাকওয়ার প্রশিক্ষণের এক সূবর্ণ সুযোগ। যদি এ মাসে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য আমরা সচেষ্ট হই তাহলে ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা আমাদের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার অভ্যাস গড়ে উঠবে এবং ধীরে ধীরে আমরা সকল গুনাহ বর্জন করতে পারবো। তাই প্রত্যেকেরই মুহাসাবা করা উচিত, রোযা অবস্থায় আমার দ্বারা কোন গুনাহ হচ্ছে কি না? এমন যেন না হয় যে, আমরা হালাল খাবার হতে তো বিরত থাকলাম, কিন্তু হারাম সম্পদ উপার্জন করলাম, স্ত্রীসহবাস হতে বিরত থাকলাম কিন্তু চোখের খেয়ানত বা অন্য কোন হারাম পন্থায় যৌন চাহিদা মিটালাম। যদিও অধিকাংশ আলেমদের মতানুযায়ী গুনাহের দ্বারা রোযা ভাঙ্গে না, কিন্তু এর দ্বারা রোযা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং রোযার সওয়াব কমে যায়,

বরং রোযার উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাকওয়া অর্জনই ব্যাহত হয়। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন। আমিন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩২৯৯

কুরআন অনুধাবন (লেকচার ও প্রশ্ন-উত্তর পর্ব)

শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি (রহঃ)

Talhah Bin Ubaidullah

Senior Member

০৯-১৫-২০১৯

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

মহান আল্লাহ কুরআনের একটি আয়াতে আহলুল কিতাবদের সম্পর্কে বলেছেনঃ "আর তাদের (ইয়াহুদিদের) মধ্যে রয়েছে নিরক্ষর লোক,যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ ছাড়া তাদের কিতাব সম্পর্কে জানে না,আর সেগুলো তো তাদের অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়।" (সূরাহ আল বাকারাহ,২ : ৭৮)

এই আয়াতে বলা হয়েছে, আহলুল কিতাবদের মধ্যে এমন অনেক নিরক্ষর (এখানে নিরক্ষর বলতে বুঝানো হয়েছে যে তারা আল্লাহর কিতাব অনুধাবন করতো না) লোক ছিল,যাদের সাথে কিতাব থাকার পরও তাদের কাছে কোন দলীল ছিল না যে তাদের কিতাব আসলে কোন বিষয়ে আলোচনা করছে। তারা তাদের কিতাব থেকে সেগুলোই শিখতো, যেগুলো তাদের পার্থিব বিষয় সম্পর্কে মানানসই হতো। তারা সেখান থেকে যা কিছুই শিখতো, সেগুলো তারা বেছে বেছে গ্রহন করতো। যদি সেগুলোর মধ্যে কোনোটি তাদের পার্থিব জীবনের জন্য উপকারী হতো তবে তারা সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহন করতো, আর তা না হলে তারা সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতো।

তো এই আয়াত আসলে কি অর্থ প্রকাশ করে ? ইবন তাইমিয়াহ বলেছেন,"ইবন আব্বাস (রাঃ) ও কাতাদাহ (রাঃ) এই আয়াতের "উম্মিইয়্যুন" (নিরক্ষর) শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটি হল এমন – "তারা কিতাবের অর্থ বুঝতো না। তারা কিতাব শিখতো,তা মুখস্ত করতো আর না বুঝেই তাদের কিতাব তিলাওয়াত করতো। এই আয়াতে উল্লেখকৃত 'নিরক্ষর' শব্দটি দিয়ে এটি বুঝানো হচ্ছে না যে,

তারা পড়তে বা লিখতে পারতো না। বরং তারা তাদের কিতাব পড়তো,মুখস্ত করতো আর সে কিতাব শিক্ষাও দিতো, যদিও তারা কিতাবের আলোচ্য বিষয় বুঝতো না। তারা কেবলমাত্র কিতাব তিলাওয়াত করেই সন্তুষ্ট হতো।"

আমাদের এই বর্তমান সময়ে আপনি দেখতে পাবেন যে, টেলিভিশন স্টেশন আর রেডিও স্টেশনগুলো কুরআন সম্প্রচার করছে। তারা এটি করে কারণ তারা জানে যে লোকেরা কুরআনের অনুসরণ করবে না, বরং তারা কুরআনের অর্থ না বুঝে কেবলই তা শুনে যেতে থাকবে। এমনকি ইসরাইলেও তারা কুরআন সম্প্রচার করে! এই সমস্যাটা আজ আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে। সুবহান-আল্লাহ! কুরআনের এই আয়াত যে অর্থটি নির্দেশ করছে ঠিক তেমন অবস্থাই আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি।

ইমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কিছু একটা বললেন, এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,"যখন ইলম হারিয়ে যাবে তখন এমনটি ঘটবে।" সাহাবীদের মধ্যে একজন [ইবন লুবাইদ (রাঃ)] বললেন, "ইয়া রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম), ইলম কিভাবে হারিয়ে যেতে পারে যখন কিনা আমরা কুরআন অধ্যয়ন করছি, এটি আমাদের সন্তানদের শিক্ষা দিচ্ছি আর আমাদের সন্তানেরা অন্যদের শিক্ষা দিবে ?" রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,"দুর্ভোগ তোমার জন্য! আমি ভেবেছিলাম তুমি মদিনার সবচেয়ে শিক্ষিত লোকদের একজন। তুমি কি দেখছো না, ইয়াহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে তাদের কিতাব (তাওরাত ও ইঞ্জিল) থাকার পরও সেখান থেকে তারা কোন উপকার পাচ্ছে না ?"

কুরআন তো সেলফে কাপড় দিয়ে ঢেকে সাজিয়ে রাখার মতো কিছু না। আবু দারদা (রাঃ) বলেন,"যখন শেষ যুগ আসবে, তখন তোমরা তোমাদের মসজিদগুলো আর মুসহাফগুলো (কুরআনের সংকলিত কপি যা আমরা একটি কিতাব হিসেবে দেখি) সাজিয়ে রাখবে,এটিই হল সেই সময় যখন তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে, কারণ এটি একটি ইঙ্গিত যে তোমরা (কুরআনের) বিষয়বস্তুর তুলনায় এর প্রতীকের (কুরআন সাজিয়ে রাখার) পক্ষে অবস্থান গ্রহন করছো।"

আবু দারদা (রাঃ) এর সময়ে কুরআন লিখে রাখা হতো হাড়,পাতা আর চামড়ার টুকরোতে। আর বর্তমানে কুরআন এমনভাবে সাজিয়ে রাখা হয় যে, লোকেরা

এমনকি সেটি ছুঁতে আর পড়তে চায় না, কারণ এটি তো দেখতে খুবই সুন্দর লাগে! যদি লোকেরা দেখতো যে, কুরআনকে হাড় বা কোন টুকরোতে লিখে রাখা হয়েছে তবে তারা সাথে সাথেই বলতো যে, এমন কাজ করার মাধ্যমে কুরআনকে অসম্মান করা হয়েছে। এরপরও লোকেরা এটি চিন্তা করে দেখে না যে কুরআন অনুসরণ না করাই হল কুরআনকে অসম্মান করা। কুরআন আমাদের জন্য কি করতে পারে, আর আমাদের কিভাবে আল্লাহর এই কিতাব অধ্যয়ন করা দরকার – সে পথ থেকে আজ আমরা হারিয়ে গিয়েছি। আল্লাহ বলেনঃ

"(এটি) একটি কিতাব (কুরআন),আমরা এটি তোমার উপর নাযিল করেছি (যা আল্লাহর) রহমতে পরিপূর্ণ,যাতে করে তারা এর নিদর্শনগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে আর জ্ঞানবান লোকেরা তা থেকে উপদেশ গ্রহন করে।" (সূরাহ সোয়াদ,৩৮ : ২৯)

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে না, নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে আছে (কুরআন অনুধাবনের ব্যাপারে) ?" (সূরাহ মুহাম্মাদ,৪৭ : ২৪)

আল্লাহ আমাদেরকে কেবলমাত্র কুরআন তিলাওয়াতের জন্য আহবান করছেন না বরং তিনি আমাদেরকে আহবান করছেন কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা ও পর্যবেক্ষণ করার জন্য। আমাদেরকে "তাদাব্বুর" (গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা) করতে হবে।

সাহাবীরা কিভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতেন ? আমরা এর একটি উদাহরন হিসেবে আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ) এর দিকে তাকাই। তিনি বলেছেন,"সুরা বাকারাহ হিফয করা শেষ করতে আমার ১৪ টি বছর সময় লেগেছে।" তিনি এটি করার পর খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন,তিনি বলেছেন,"আর এরপর আমি একটি উট জবাই করে লোকদের আমন্ত্রন করলাম।" এটি তার জন্য এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল যে, তিনি সেদিন এ কারনে লোকদের দাওয়াত করে রীতিমত উৎসবের দিন করে ফেলেছিলেন। আমরা এখন কুরআন এক বছরের মধ্যেই মুখস্ত করতে পারি, আবদুল্লাহ ইবন উমার (রাঃ) এর ক্ষেত্রে কিভাবে দীর্ঘ ১৪ বছর সময় লাগলো ?

এর কারণ হল সেটিই,যা একজন তাবিঈন বর্ণনা করেছেন এভাবে – "আমি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কয়েকজন সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ লাভ করেছিলাম, তারা আমাকে বললেন যে, তারা যেভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতেন সে পদ্ধতি ছিল এমন – তারা দশটি আয়াত গ্রহন করতেন, এরপর সেই দশটি আয়াত অধ্যয়ন করতেন, তারা সেসব আয়াতে ঈমান,ইলম,হালাল ও হারাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করতেন, এরপর পরবর্তী দশ আয়াতে চলে যেতেন। তারা সেই দশ আয়াত তাদের জীবনে প্রয়োগ করার আগ পর্যন্ত পরবর্তী আয়াতে যেতেন না,এটি তাদের জীবনে প্রানবন্ত ও দ্বিতীয় স্বভাব না হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা এমনটি করতেন। এটি শুধু একজন সাহাবী নয়, বরং অনেক সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।"

ইমাম আহমাদ আল গাযালি (রহ.) বলেন,"দশ বছর বয়সে আমি কুরআন হিফয করেছিলাম। আমি কুরআন হিফযের সেই পদ্ধতির (অনুধাবন না করে আর অর্থ না বুঝে শুধুমাত্র তিলাওয়াত করে হিফয করার পদ্ধতি) কারনে বড় হওয়ার পর যখন আল্লাহর কিতাব অনুধাবনের চেষ্টা করি, তখন আমার কাছে এই ব্যাপারটি খুবই কঠিন মনে হল কারণ আমাকে শুধুমাত্র আয়াতের পুনরাবৃত্তি করার মাধ্যমেই কুরআন হিফয করা শিখানো হয়েছিলো। এই চক্রটি ভেঙ্গে বের হয়ে আসার আগ পর্যন্ত আর আল্লাহর কালাম নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার আগ পর্যন্ত আমাকে প্রচুর চেষ্টা ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিলো।"

তিনি এমন একটি সমস্যার কথা বলেছিলেন যেটা বর্তমানে এই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায়ও বিদ্যমান রয়েছে। তিনি বলেছেন শিশুদের মধ্যে না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করে কুরআন হিফযের এক সাধারণ পদ্ধতির ব্যাপারে। আল্লাহর কিতাব বুঝার জন্য আমাদেরকে প্রচণ্ড রকম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। মূল ব্যাপার তো হল এই যে,আল্লাহ আমাদের উপর কুরআনের মণি-মুক্তো এমনিতেই বর্ষিত করবেন না। যদি আমরা এই কিতাব শেখার জন্য আর এটি থেকে হিদায়াত পাওয়ার জন্য আগ্রহী না হই, তবে এই কিতাব আমাদের কোন উপকার করবে না। এটি হল কুরআনের একটি আকর্ষণীয় দিক। আল্লাহ বলেনঃ

“আমি কুরআনে যা নাযিল করেছি তা হল মুমিনদের জন্য (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালিমদের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।”(সূরাহ আল-ইসরা,১৭ : ৮২)

কুরআন কিছু লোককে কাছে টেনে নিয়ে আসে আর কিছু লোককে দূরে সরিয়ে দেয়। যদি আপনি কুরআন থেকে উপকার পেতে চান তবে আপনি এটি থেকে সেটিই পাবেন, আর যদি তা না চান, এরপরও আল্লাহ তার কিতাবকে সম্মানিত করবেন। এটি হল মহান আল্লাহ’র স্বতন্ত্রতার অংশ।

এখানে আলোচ্য বিষয় এটি না যে সুরা বাকারা শিখার জন্য আমরা ৪০ বছর সময় ব্যয় করব বরং ব্যাপারটা হল এমন যে, আমরা যা শিখছি তা বাস্তবে প্রয়োগ করছি কিনা সেটি সুনিশ্চিত হওয়া। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,“এ পৃথিবীর শেষ যুগে বোকামিপূর্ণ চিন্তা আর ধারনা বিশিষ্ট যুবকদের দেখা যাবে। তারা ভাল কথা বলবে কিন্তু ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে ঠিক সেভাবে, যেভাবে তীর একটি ধনুক থেকে বের হয়ে যায়,তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না ...” (বুখারি)

এ যুগে কুরআন তিলাওয়াত করা হয় কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে বা শেষে। লোকেরা তাদের পুরো জীবন অতিক্রম করে কুরআনকে সেলফে বসিয়ে রাখার মাধ্যমে, আর যখন তারা মারা যায় তখন লোকেরা এটি সেলফ থেকে বের করে আনে আর সেখান থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করে, এরপর এই কুরআনকে আবারো সেই সেলফে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। কোন একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করা হয় আর কেউ মারা গেলে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করা হয় – কুরআনের হক আদায়ের জন্য লোকেরা এসব করে! সুবহান-আল্লাহ! প্রথম যুগের মুসলিমদের (সাহাবীদের) জন্য আল্লাহ’র কিতাব ছিল একটি প্রবাহমান শক্তি। সাহাবীদের সেরকম ভিন্ন হওয়ার কারণ কি ছিল ? কারণটি ছিল কুরআন,আর কিছুই না। এই কুরআনই সাহাবীদের পুরোপুরি পরিবর্তন করে দিয়েছিলো তাদেরকে নিম্নস্তর থেকে উচ্চস্তরের মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে। আমাদের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটবে যদি আমরা কুরআনের উপর তাদাব্বুর (গভীরভাবে চিন্তাভাবনা) করি।

মুজাহিদ (রহ.) ছিলেন কুরআনের মুফাসসিরদের মধ্যে একজন। তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) এর কাছে কুরআন শিখতেন। তার নাম তাফসিরের কিতাবগুলোতে উল্লেখ করা হয়। তিনি ছিলেন ইবন আব্বাস (রাঃ) এর একজন ছাত্র। বলা হয়ে থাকে, তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) এর সাথে তিনবার পুরো কুরআন তিলাওয়াত করেন,প্রত্যেক আয়াতে এসে পৌঁছানোর পর তিনি ইবন আব্বাস (রাঃ) কে সেই প্রতিটি আয়াত সম্পর্কেই জিজ্ঞেস করতেন। মুজাহিদ (রহ.) বলেন,"প্রত্যেক আয়াত তিলাওয়াতের পর আমি থেমে গিয়ে ইবন আব্বাস (রাঃ) কে সেই আয়াতের অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম।"

আল্লাহর কিতাবকে সাথে নিয়ে জীবন পরিচালনা করা আর একে খুব সিরিয়াসলি গ্রহন করা এটি দাবী করে যে, আমরা আল্লাহর কিতাবকে ভালোবাসবো। কুরআনের সাথে নিজেদের সংযুক্ত না রেখেই যদি আমরা তা তিলাওয়াত করি, তবে আমরা তা থেকে উপকার পাব না। এটি বুঝা যায় উসমান ইবন আফফান (রাঃ) এর এই উক্তি থেকে – "যদি অন্তরগুলো বিশুদ্ধ হয়, তবে সেগুলো আল্লাহর কিতাবের তৃষ্ণায় কখনও পরিতৃপ্ত হবে না।" আমরা যদি আল্লাহর কিতাবকে ভালোবাসি, তবে আমরা কখনোই যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হবো না।

যখন তাবিঈনদের একজন ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবন উমার এর জীবনের ব্যাপারে খোঁজ নিতে চাচ্ছিলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবন উমারের দাসের কাছে তার ইবাদাতের ব্যাপারে জানতে চাইলে সে বললঃ "তিনি সালাত আদায় করতে যেতেন আর মধ্যবর্তী সময়টাতে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।" এটি ছিল এমনই এক সাধারণ ব্যাপার। যদি তিনি ব্যাবসা বা অন্য কিছুর সাথে জড়িত না থাকতেন, তবে বাসায় থাকার সময়টাতে তিনি এটি করতেন। আমাদের জীবনের সাথে এর কি তুলনা হতে পারে যেখানে আমাদের মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হয় আর আমরা আল্লাহর কিতাব খুলেও দেখি না! আবদুল্লাহ ইবন উমারের জীবনটা কুরআনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে।

উসমান ইবন আফফান (রাঃ) কিয়ামুল লাইল (রাত্রিকালীন সালাত) শুরু করার পর দুই রাকআতে যে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করতেন তাতে তার রাত অতিবাহিত হয়ে যেতো,এরপরও তার সেই দুই রাকআত সালাত শেষ হতো না। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা সালাতে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর আমরা নিশ্চিত যে তিনি

এতে কোন রকম বিরক্তি বা যন্ত্রণা অনুভব করতেন না, কারণ এটি ছিল আল্লাহর কিতাবের সাথে তার সম্পৃক্ততা। আল্লাহ তার জন্য এটি সহজ করে দিয়েছিলেন।

রসুলুল্লাহ (সালাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কিয়ামুল লাইলের ব্যাপারে আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তার পায়ের চামড়া ফেটে যেতো। আমি তাকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে জিজ্ঞেস করলাম,"আপনি কেন এমনটি করছেন, যখন কিনা আপনার আগে-পরের সব পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে ?" তিনি (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,"আমি কি আল্লাহর শোকরকারী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হবো না ?" (বুখারি ও মুসলিম)

রসুলুল্লাহ (সাল্লালাহু) আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে সালাতে লিপ্ত হতেন যে, এর দীর্ঘতার কারনে তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন বিরক্তি আসতো না। অপর একটি হাদিসে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সালাত সম্পর্কে বলেছিলেন, "আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হল সালাত।"

আমাদের যেটা করা দরকার, সেটি হল আল্লাহর কিতাবের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা আর কুরআন অধ্যয়ন থেকে সরে না যাওয়া। অন্যান্য ইসলামিক জ্ঞান বিজ্ঞানও অধ্যয়ন করা ভালো তবে সেগুলো কুরআন অধ্যয়নের উপায়ে হতে দেওয়া যাবে না। অনেক সময় আমরা কুরআন বাদ দিয়ে সব কিছুই অধ্যয়ন করি, আর মনে করি যে আমরা অনেক কিছুই জেনে ফেলেছি। আমরা যদি কুরআন অধ্যয়ন না করি, তবে এটি চিন্তা করাটা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়বে যে, আমরা যা জানি তা আসলেই পর্যাপ্ত কিনা। কুরআন নিয়ে আমাদের একটি ব্যাপক বুঝ থাকা দরকার – সেটি কেবলমাত্র কোন একক ধাপে নয় বরং যে উপায়ে আমরা পৃথিবী দেখি আর বুঝি সে উপায়েও এটি করা দরকার।

এর একটি উদাহরন হল – সাহাবীরা কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর এটি ছিল তাদের জন্য জ্ঞানের একমাত্র উৎস। ইসলামপূর্ব সময়ে তারা ছিলেন জ্ঞানহীন নিরক্ষর লোক। কোন এক ঘটনায় কয়েকজন সাহাবী দেখতে পেলেন যে, উমার ইবন আল-খাত্তাব (রাঃ) প্রথমে হাসলেন, আর এরপর তিনি কাঁদতে লাগলেন। সাহাবীরা তার কাছে জানতে চাইলেন কি কারনে তার এমনটা হলো। তিনি বললেন,"আমি জাহিলিয়্যাহ'র দিনগুলোর কথা মনে করছিলাম। আমার কাছে

খেজুরের তৈরি প্রতিমা থাকতো। একদিন আমি এতোই ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লাম যে, আমি এর একটিকে খেয়ে ফেললাম। এটি মনে পড়ার পর আমি হাসলাম। আর এরপর আমি কাঁদলাম একারনে যে, আমার মনে পড়লো আমি একটি গর্ত খুঁড়ে আমার মেয়েকে মাটিতে পুঁতে দিয়েছিলাম। যখন আমি তাকে গর্তে রাখলাম, তখন সে তার হাত তুলে আমার দাঁড়ি থেকে ধুলো ঝেড়ে দিলো।"

মুসলিম হিসেবে এই ঘটনাগুলোর কারনে তিনি হেসেছেন আর এরপর কেঁদেছেন। ইসলামে না থাকা অবস্থায় এই মুহূর্তগুলো তার কাছে মজার বা দুঃখজনক ছিল না, বরং সেগুলো ছিল সাধারণ। ইসলামে না থাকা অবস্থায় খেজুরের তৈরি প্রতিমাকে সিজদাহ করার পর সেটিকেই খেয়ে ফেলা অবশ্যই চমৎকার আর গ্রহণযোগ্য, আর একটি জ্যান্ত কন্যা শিশুকে হত্যা করাও গ্রহণযোগ্য। ইসলামই তো উমার (রাঃ) কে পরিবর্তন করে দিলো। আর এক্ষেত্রে মূল বিষয়টি ছিল কুরআন। সুতরাং সাহাবীদের মধ্যে কুরআন ছাড়া কিছুই ছিল না,তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কোন শিক্ষাও ছিল না। ইসলাম গ্রহনের পর তাদের কাছে ছিলো সে জ্ঞানটিই, যা তারা আল্লাহর কিতাব থেকে শিখতে পেরেছিলেন।

আনাস ইবন মালিক (রাঃ) এর মা উম্ম মাহারা (রাঃ) কুরআন অধ্যয়ন করে বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহর এ দ্বীন ইসলাম বিস্তার লাভ করবে আর ভুমি ও সমুদ্রপথে জিহাদ পরিচালিত হবে। তাই তিনি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে গিয়ে বললেন,"যারা সমুদ্রপথে জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ করতে বের হবেন, আমি তাদের মধ্যে একজন হতে চাই।" (নোটঃ মক্কা ও মদিনার লোকদের জন্য এটি ছিল অস্বাভাবিক, কারণ তারা সাধারনত সমদ্রপথে আসা যাওয়া করতো না। আরবদের কোন সামরিক নৌবাহিনী বা সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল না। তারা ভুমি ব্যবহার করেই ইয়েমেন ও শামের সাথে ব্যবসা করতো। উপকূলবর্তী লোকদেরই সমুদ্রের ব্যাপারে অভিজ্ঞতা ছিলো, আর সে সময় এমন কোন সাহাবী ছিলেন না যারা উপকূলবর্তী অঞ্চলে বাস করতেন) রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এ মহিলা সাহাবীর জন্য দুয়া করলেন যাতে তিনি সেই ব্যক্তিগুলোর মধ্যে একজন হতে পারেন। পরবর্তীতে মুওাওিয়া বিন আবি সুফইয়ান (রাঃ) এর খিলাফাহ চলাকালীন সময়ে যেসব মুজাহিদ সমুদ্রপথে জিহাদের জন্য যোগদান করেন, তিনি তাদের একজন হোন। কুরআন অধ্যয়নের

মাধ্যমে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আল্লাহ সমুদ্রপথকে আমাদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবেন। আল্লাহ বলেছেনঃ

"তিনিই সমুদ্রকে (তোমাদের) অধীনস্থ করে দিয়েছেন,যেন তার মধ্য থেকে তোমরা তাজা মাছ খেতে পারো এবং তা থেকে তোমরা (মণিমুক্তার) গহনাও আহরণ করো,যা তোমরা পরিধান করো,তোমরা দেখতে পাচ্ছো কিভাবে এর বুকে জলযানগুলো এগিয়ে চলে, যেন এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো,(সর্বোপরি) তোমরা যেন তার (নিয়ামতের) কৃতজ্ঞতা আদায় করো।" (সূরাহ আন-নাহল,১৬ : ১৪)

যদিও তিনি কখনও সমুদ্রে যান নি,এরপরও তিনি কুরআন পাঠের মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, একদিন এই দ্বীন ইসলাম সমুদ্রপথের মধ্য দিয়েও বিস্তার লাভ করবে।

বর্তমানে বিশ অথবা ত্রিশ হাজার জাহাজ বিশ্বের সমুদ্রপথগুলোতে চলাচল করছে। সমুদ্রগুলো ভুপৃষ্ঠের ৮/১০ ভাগ অবস্থান জুড়ে বিরাজ করছে। এই জাহাজগুলোর একটিও মুসলিমরা নির্মাণ করে নি। একটি সাবমেরিনও মুসলিমরা তৈরি করে নি। সুতরাং উপরে উল্লেখ করা সেই আয়াতে যা উল্লেখ করা হয়েছে সেটির ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কোথায় ? কুরআন নিয়ে আমাদের অনুধাবনের অবস্থানটা কোথায় ? যদিও সাহাবীদের সাথে সমুদ্রের কোন সংস্পর্শই ছিলো না, কিন্তু এরপরও তারা অবিলম্বে নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন। মুওাওিয়াহ ইবন আবি সুফইয়ান (রাঃ) ছিলেন ইসলামিক নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা, আর একই সাথে ইসলামিক বাণিজ্যিক নৌবহরের প্রতিষ্ঠাতাও, এরপর কয়েক শতাব্দির জন্য মুসলিমরা পুরো বিশ্বে প্রভাবশালী বাণিজ্যিক শক্তিতে পরিণত হলো সেই সামরিক নৌবাহিনী আর বাণিজ্যিক লেনদেনের কারনে। সুতরাং এটি পরিস্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর কিতাব সঠিকভাবে অনুধাবনের ব্যাপারে আমরা অনেক দূরেই আছি।

আমরা আল্লাহর কাছে দুয়া করছি তিনি যেন আমাদেরকে তার দ্বীনের ব্যাপারে ফিকহ (বুঝ) দান করেন আর আমাদের সকলকে কল্যাণ দান করেন,আমিন।

প্রশ্ন-উত্তর পর্ব

(১) প্রশ্নঃ অনেক দেশের লোকেরা তাদের নিজেদের ভাষাই ঠিকমতো জানে না এরপরও তারা কুরআন আরবিতে পড়তে শিখে। এ ধরনের লোকেরা কি এটি থেকে কোন উপকার পাবে? এ পরিস্থিতির উন্নতির জন্য আপনি কি উপদেশ দিবেন ?

উত্তরঃ আমি মনে করি এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। সবাই আরবি না বুঝার পরও আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করতে ভালবাসে, আর একারনেই দেখা যায় যে তারা না বুঝেই কুরআন তিলাওয়াত করে। আপনি কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করলেও সওয়াব পাবেন। কুরআন না বুঝে কেবল তিলাওয়াত করাটাও একটা ইবাদাত। এর ব্যাপারে যে দলীল আমরা পাই, সেটি হলো রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সে হাদিস,যেখানে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,"যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি অক্ষর পড়বে তাকে একটি সওয়াব দেওয়া হবে, আর এই সওয়াবকে দশগুণ করা হবে। আমি বলছি না যে 'আলিফ,লাম,মিম' একটি অক্ষর, বরং আমি বলছি যে 'আলিফ' একটি অক্ষর,'লাম' একটি অক্ষর আর 'মিম' একটি অক্ষর।" (তিরমিযি)

বেশ কিছু সূরা শুরু হয় 'আলিফ','লাম', 'মীম' – এ তিনটি অক্ষর দিয়ে; কিন্তু এই অক্ষরগুলো দিয়ে আসলে কি বুঝায় ? এমনকি আরবি ভাষীদের বেশীরভাগ লোকই এই অক্ষরগুলো কি অর্থ প্রকাশ করছে তা বুঝে না। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ অক্ষরগুলো বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ হলো এই যে, বেশীরভাগ লোকেরই ধারনা নেই এই অক্ষরগুলো দিয়ে আসলে কি বুঝানো হচ্ছে, আর তাই এভাবে বলার মাধ্যমে এটি বুঝানো হলো যে লোকেরা কুরআন না বুঝে তিলাওয়াত করলেও সওয়াব পাবে।

কুরআন তিলাওয়াত করে সওয়াব পাওয়া একটা বিষয়, আরেকটা বিষয় হলো কুরআনকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা। আপনি আরবি শিখুন বা না শিখুন,আরবি জানুন বা না জানুন,কুরআন অনুসরন না করার জন্য সেটি কোন অজুহাত হতে পারে না। কুরআনের আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানার জন্য আপনি কুরআনের

অনুবাদ পাবেন। আসল সমস্যাটা তো এটিই যে, একজন ব্যক্তি কুরআন কি বলছে তা জানার আর প্রয়োগের চেষ্টা করছে না। সুতরাং একজন ব্যক্তির পক্ষে কুরআনের ভাষা না বুঝা সত্ত্বেও উচিত হবে সওয়াব আর বাস্তবে প্রয়োগের জন্য কুরআন পাঠ করা। ভাষাটি না জেনেও এটি করা যায়। কুরআনের অর্থে তাদাব্বুর হলো এমন একটা ব্যাপার, যা কিনা কুরআনের অনুবাদ পড়েও করা যায়। কিন্তু এটি অবশ্যই কুরআন যে ভাষায় (আরবি) নাযিল হয়েছিলো, সে ভাষায় গভীরভাবে চিন্তা করার থেকে সবসময়ই কম কার্যকর আর অগভীর হবে। তাই লোকদের উচিত হবে কুরআনের ভাষাটি শেখা।

যে ভাষাটি পুরো বিশ্বজুড়ে ব্যবহার করা হয়,যেটা কিনা ইন্টারনেটের ভাষা, যে ভাষার কারনে পুরো বিশ্বে কর্মক্ষেত্রের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায় -যদি দুনিয়ার সে ভাষাটি (ইংলিশ) শেখার জন্য প্রচণ্ড রকম চেষ্টা করা যায়, তবে কেন আমরা এর থেকে বেশি পরিমান চেষ্টা করব না সে ভাষা শেখার জন্য, যেটা কিনা আমাদের পরকালের জীবনের ভাষা ?

আল্লাহ আপনাকে আপনার নিয়্যাতের জন্য পুরস্কৃত করবেন। ইবন আল জাওজি (রহ.) বলেন, "হয়তোবা আল্লাহ আপনাকে কোন কাজ করার থেকে সেই কাজের নিয়্যতের জন্যই অধিকতর পুরস্কৃত করবেন।" সুতরাং আল্লাহ আপনার কাছে এটি চান যে, আপনি যেন চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

(২) প্রশ্নঃ সেই ব্যক্তিদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন যারা বলে,"সাহাবীরা যেভাবে কুরআন বুঝেছিলেন আমাদের সেভাবে বুঝার দরকার নেই,আমরা আমাদের নিজেদের মত করেই কুরআনকে বুঝে নিবো ?"

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

"(এ সকল নবীকে) আমি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ ও কিতাব সহকারে পাঠিয়েছি, (একইভাবে আজ) তোমার কাছেও কিতাব নাযিল করেছি যাতে করে যে (শিক্ষা) মানুষদের জন্য তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে তুমি তা তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাতে পারো,যেন তারা (নিজেরাও একটু) চিন্তা ভাবনা করে।" (সূরাহ আন-নাহল,১৬ : ৪৪)

আমরা কুরআনের ব্যাখ্যা পাই রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছ থেকে। আর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সরাসরি ছাত্র ছিলেন কারা? সাহাবীরা। তাই সাহাবীরাই হলেন কুরআন বাস্তবায়নের আদর্শিক প্রজন্মের উদাহারন। কুরআন অনুধাবনের জন্য রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিস আর সাহাবীদের জীবনী জানাটা খুবই প্রয়োজন। কোন বই-ই যথার্থ উদাহারন ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব নয়। আমরা যদি রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছ থেকে ব্যাখ্যা গ্রহন না করি আর যদি খুলাফায়ে রাশিদিন যেভাবে কুরআনের আয়াতগুলো বুঝে নিয়েছিলেন তার দিকে না দেখি, তবে আল্লাহর কিতাবের আয়াতগুলো বুঝতে গিয়ে আমাদের মধ্যে প্রচুর পরিমানে মতভেদ দেখা যাবে। কারণ আরবি একটি সমৃদ্ধশালী ভাষা,একটি শব্দের ১৫ টি ভিন্ন ভিন্ন অর্থ থাকতে পারে। আমরা কিভাবে তার অর্থ বুঝতে পারব যদি আমরা রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) আর সাহাবীদের জীবনীতে ফিরে গিয়ে তাতে দৃষ্টিপাত না করি ?

আল্লাহর নাযিলকৃত আয়াতগুলো পুরোপুরিভাবে বুঝার জন্য আমাদেরকে সেই আয়াত নাযিলের পরিবেশ ও পরিস্থিতি বুঝতে হবে। এর একটি উদাহারন হলো এই আয়াতঃ

"... আর তোমাদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।" (সূরা বাকারাহ,২ : ১৯৫)

মুসলিম ও রোমানদের মধ্যে একটি যুদ্ধ চলছিলো। এক মুসলিম সেনা মুসলিম সেনাবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হঠাৎ করে রোমানদের দিকে দৌড়ে গেলেন। তিনি রোমান সেনাদের মধ্যে একাই ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিছু মুসলিম সেনা এটি দেখে বলে উঠলেন,"এই লোকটি তো নিজেই নিজের ধ্বংসের কারণ হলো (কারণ সে এটি করার মাধ্যমে প্রাণ হারালো)।" আবু আইয়ুব আল-আনসারি (রাঃ) বললেন, "তোমরা এই আয়াতের অর্থ বুঝলে না। এই আয়াত তো আমাদের (আল-আনসারদের) ব্যাপারে বলেছে। আল্লাহ যখন মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিজয়ী করলেন, তখন আমরা বলেছিলাম,"আল্লাহ যেহেতু এখন তার রসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিজয় দান করেছেন, তাই আমরা আমাদের খামার ও ব্যবসাগুলোতে ফিরে যেতে পারবো, যেহেতু রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এখন বিজয়ী।" (নোটঃ

আনসাররা ইসলামের জন্য ব্যাপক ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন,এমনকি তাদের খামার ও ব্যবসায় ক্ষতি হয়েছিলো,তাই তারা তখন বললেন যে তারা ফিরে গিয়ে তাদের খামার ও ব্যবসার দেখাশুনা করবেন।) এরপর আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করে আমাদের জানিয়ে দিলেন যে, আমরা যদি তা করি তবে সেটি করার মাধ্যমে আমরা নিজেদের ধ্বংসের কারণ হবো। যদিও রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বিজয়ী হয়েছিলেন, কিন্তু এরপরও আমাদের উচিত হবে না রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে ছেড়ে চলে যাওয়া, বরং তার (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথেই আমাদেরকে থাকতে হবে আর আমাদের ত্যাগ স্বীকার করা চালিয়ে যেতে হবে।"

আর এভাবেই আবু আইয়ুব আল-আনসারি (রাঃ) আমাদেরকে এই আয়াতের সঠিক বুঝটি দান করলেন। তিনি আমাদেরকে এটি না জানালে এই আয়াত সম্পর্কে এই বুঝটি আমাদের হতো না।

(৩) প্রশ্নঃ যেসব ভাই-বোনেরা আরবি বুঝেন না তাদেরকে আপনি কি কি বই অধ্যয়নের পরামর্শ দিবেন?

উত্তরঃ আমি মনে করি যাদের কাছ থেকে এটি জানতে চাওয়া উচিত, আমি তাদের মধ্যে একজন নই, কারণ কুরআন সম্পর্কিত সকল কিতাব আমি আরবিতেই পড়েছি। সুতরাং আমি যা জানি সেটির ব্যাপারেই বলবো, আমি আরবি বইগুলোর ব্যাপারেই বলবো।

কয়েক ধরনের তাফসীর আছে,এর মধ্যে একটি হলো তাফসীর বিল মাশহুর। এ ধরনের তাফসীর কিতাবে কুরআনের তাফসীর করা হয় কুরআনের আয়াত,হাদিস আর সালাফদের উক্তি ব্যবহার করার মাধ্যমে। এই শ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কয়েকটি তাফসীর কিতাব হলো তাফসীরে আত-তাবারী,তাফসীরে ইবন কাসির ও তাফসীরে আশ-শাওকানি। তাফসীরে ইবন কাসির হলো তাফসীরে তাবারীর সংক্ষিপ্ত সংস্করনের মতো একটা তাফসীর কিতাব,যেখানে ইবন কাসির ইসরায়েলি বর্ণনা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাফসীরে তাবারীতে এই ধরনের বর্ণনা প্রচুর দেখা যায়। যদিও ইবনে কাসির তার তাফসীরের কিতাবে তাবারীর মত ব্যাপকভাবে ইসরায়েলি বর্ণনা ব্যবহার করেন নি, কিন্তু তাবারী তার কিতাবে

সেগুলোর কিছু বর্ণনা ব্যবহার করেছেন। আশ-শাওকানির তাফসীর কিতাবটি তাফসীর বিল মাশহুর হলেও এতে ভাষাগতভাবেও তাফসীর করা হয়েছে।

আরেক ধরণের কুরআন তাফসীর হলো যেগুলোতে কুরআনের ফিকহ এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, যেমন ইমাম কুরতুবি রচিত আল-জামি আল-আহকামুল কুরআন।
ভাষাগত তাফসীরের জন্য ইবন আল-জাওজির যা'দ আল-মাসীর কিতাবটি বেশ ভালো। কুরআনের বিভিন্ন শব্দের অর্থ খুঁজে দেখার জন্য এটি বেশ ভালো বই।

কুরআন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা আর ধারণা নিয়ে রচিত কিতাব, যেগুলো কিনা তাফসীরের শ্রেণীবিভাগের মধ্যে পড়ে না কিন্তু সেগুলো কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তার ফলাফল,এমন দুটো কিতাব হলো সায়্যিদ কুতুবের ফি জিলালিল কুরআন আর মাওদুদির তাফহিমুল কুরআন।

তাফহিমুল কুরআন থেকে কিছু অংশ তুলে ধরা হলোঃ "এরপরও মনে রাখতে হবে, কুরআনের সারমর্মের পরিপূর্ণ উপলব্ধি তো এটি দাবী করে যে, কুরআন প্রেরণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এর সাথে কার্যকর সম্পৃক্ততা বজায় রেখে প্রবল প্রচেষ্টা করে যেতে হবে। কুরআন কোন দুর্বোধ্য তত্ত্ব ও শীতল মতবাদের কিতাব না যা কিনা এর পাঠক কোন হাতল বিশিষ্ট আরামদায়ক চেয়ারে বসে উপলব্ধি করতে পারবে, আর না এটি অন্যান্য ধর্মের বইগুলোর মত নিছকই একটি বই – যার গোপন রহস্য উপলব্ধি করার জন্য সেমিনার বা বাগ্মিতার প্রয়োজন রয়েছে। পক্ষান্তরে এটি হলো একটি বিপ্লবের উদ্দেশ্যে পাঠানো বার্তার প্রতিচিত্র ও পথনির্দেশিকা। এই কিতাব নাযিল হওয়ার পরেই বিচ্ছিন্নভাবে ও নির্জনভাবে থাকা এক সদয় হৃদয়ের মানুষকে এটি দিয়ে পুরোপুরিভাবেই পরিচালিত করা হলো আর তাকে জীবনযুদ্ধের ময়দানে নামিয়ে দেওয়া হলো যাতে করে তিনি ভ্রান্তিতে ডুবে থাকা বিশ্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। এই কিতাব তাকে অনুপ্রানিত করেছিলো মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে আর তাকে স্থির করে দিয়েছিলো কুফরের মানদণ্ডের ধারকদের বিপক্ষে এবং স্রস্টার অবাধ্যতার আর খামখেয়ালিপনা ও ভুল-ভ্রান্তির বিপক্ষে এক কঠোর সংগ্রামে।"

আমি মনে করি তিনি এখানে যা বলেছেন – "কুরআন কোন দুর্বোধ্য তত্ত্ব ও শীতল মতবাদের কিতাব না যা কিনা এর পাঠক কোন হাতল বিশিষ্ট আরামদায়ক চেয়ারে

বসে উপলব্ধি করতে পারবে ...” –সাহাবীদের ক্ষেত্রে কুরআন অনুধাবন স্বতন্ত্র হওয়ার কারণ হলো, তারা কুরআন সাথে নিয়েই বিভিন্ন ঘটনার সম্মুখীন হয়ে জীবন পরিচালনা করছিলেন, তাদের জীবনের সাথে দাওয়াহ মিশে গিয়েছিলো।

কেউ যদি দাওয়াহ করার সাথে সম্পৃক্ত না থাকে অথবা ইসলামের পথে সংগ্রামের মধ্যে না থাকে, তবে তার কুরআন অনুধাবনের কোন মূল্য নেই। আমি এখন একটি আরামদায়ক বিছানায় বসে পুরো কুরআন পড়ে শুনাতে পারবো,এর আয়াতগুলোর উপর গভীরভাবে চিন্তাও করতে পারবো, কিন্তু এ কাজটা করা আমি বর্তমান সময়ে বেঁচে থাকা কারও জন্য তারিফ করবো না। আমি এমন একটা ঘটনা প্রত্যাহার করতে পারি না যেটা এর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। অবশ্য এর সাথে পরোক্ষভাবে যুক্ত কোন ঘটনা প্রত্যাহার করা যায়। উদাহারন হিসেবে তাকদিরের অন্তর্ভুক্ত বিষয় আল-কদরের ব্যাপারে বলা যায়। আল্লাহ বলেছেন,“মৃত্যুর সময়টি এগিয়েও যাবে না বা এতে দেরিও হবে না।” মৃত্যুর সময়টি নির্ধারিত, আর আমরা এই মৃত্যুর ধারনাটি নিয়ে আলোচনা করতে পারি এবং আপনাদেরকে এর উপর ঘণ্টাব্যাপী একটি সিরিজ লেকচারও দিতে পারি যে, আল্লাহ কিভাবে মৃত্যুকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন আর আপনি আপনার সেই নির্ধারিত সময়ের এক মিনিট পূর্বে মারা যেতে পারবেন না বা এক মিনিট পরও বেঁচে থাকতে পারবেন না।

একজন ভাই আমাকে বসনিয়ার একটি ঘটনা সম্পর্কে বললেন। দুই ভাই একটি পরিখার মধ্যে ছিলেন, সার্বস কতৃক নিক্ষিপ্ত একটি মিসাইল তাদের দুজনের মধ্যে ভূপাতিত হয়ে সেটি বিস্ফোরিত হলো আর এক ভাই ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। মিসাইলটি সেই ভাইটিকে টুকরো টুকরো করে ফেললো, অথচ অপর ভাইয়ের শরীরে আঁচড়ও পড়েনি,তার কিছুই ঘটলো না! বেঁচে থাকা সেই ভাইটি তার নিজের চোখের সামনেই মৃত্যুকে দেখলেন,তিনি দেখলেন তাদের উভয়ের মাঝে একটি মিসাইল ভূপাতিত হওয়ার পর তার অপর ভাইকে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে। এখন বেঁচে থাকা সেই ভাইকে আল-কদর নিয়ে হাজারটি লেকচার দিলেও তিনি তার চোখের সামনে যে প্র্যাক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সেটির মত মূল্যবান হবে না সেই লেকচারগুলো। সুতরাং অনেক সময় অভিজ্ঞতা একজন ব্যক্তির উপর খুবই প্রভাব রাখে।

কুরআনের অনেক আয়াতেই সাহাবীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে,খন্দকের যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

"যখন (ভয়ে) তোমাদের চোখ বিস্ফোরিত হয়ে পড়েছিলো,প্রান হয়ে পড়েছিলো কণ্ঠাগত ..." (সূরাহ আল-আহযাব,৩৩ : ১০)

আমরা সাহাবীদের সেই অনুভূতি সত্যিকার অর্থে কখনোই অনুভব করতে পারবো না যদি না আমরা তাদের মত সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাই। এ কারনেই যারা দাওয়াহ'র কাজ করেন, তারা কুরআনে বর্ণিত নবী-রসূলদের ঘটনা আর দাওয়াহ সম্পর্কিত ঘটনাগুলোর মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন। যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণের মতো কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছেন, তিনি নুহ (আঃ) এর কাহিনী উপলব্ধি করতে পারবেন; যিনি দুর্নীতি,অবক্ষয় ও স্বেচ্ছাচারিতাযুক্ত পরিবেশের মধ্যে বসবাস করছেন, তিনি লুত (আঃ) এর সংগ্রাম সম্পর্কে আনুধাবন করতে পারবেন; কিন্তু যিনি এসব সংগ্রাম থেকে দূরে থেকে আরামদায়ক পালঙ্কে বসে আছেন আর সত্যিকারের দুনিয়া থেকে দূরে সরে আছেন, তিনি কেবলমাত্র তত্ত্বই অধ্যয়ন করে যাচ্ছেন,আল্লাহই ভালো জানেন।

(৪) প্রশ্নঃ কুরআন তিলাওয়াতের সবচেয়ে সেরা উপায়টি কি ? আমরা কি কেবল সিডি থেকে কুরআন শুনতে পারি আর কুরআন তিলাওয়াতকারীর তিলাওয়াতের অনুসরণ করতে পারি ?

উত্তরঃ এটি নির্ভর করে ব্যক্তি কি আরবিতে কথা বলতে পারেন নাকি পারেন না সেটির উপর। কারণ আরবিতে কথা বলেন না, অথবা আরবিতে কথা বলতে পারেন এমন একজন ব্যক্তিও অনেক সময় তাজবিদের আহকাম সম্পর্কে পরিচিত থাকেন না। আমি বলবো যে, শুরুতেই এমন কারও সাথে শেখা গুরুত্বপূর্ণ যিনি তাজবিদের আহকাম সম্পর্কে জানেন। শুরুতেই এটি করার মাধ্যমে ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হবে, এরপর ব্যক্তি নিজের মত করে শুরু করতে পারেন। সিডি অথবা টেপে রেকর্ড করা তিলাওয়াত শুনার ব্যাপারটা ভালোই, কারণ আপনি আহকামের সাথে তিলাওয়াত শিখতে পারছেন। কিন্তু আপনার যদি আহকাম জানা না থাকে, তবে আপনি তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখতে পারেন, আর সেটি ভুল উপায়ে মুখস্ত করার একটা সম্ভাবনাও থাকে।

সুতরাং এটি গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআন তিলাওয়াত প্রাথমিক ধাপে এমন কারও সাথে শিখবেন, যিনি তাজবিদের সাথে পরিচিত। আমি এমন লোকের কথাও জানি, যিনি তাদের কাজের ফাকে কুরআন শুনার মাধ্যমে কুরআন মুখস্ত করেছেন। একজন ব্যক্তি সিডি বা টেপ থেকে কুরআন শোনার মাধ্যমে পুরো কুরআন মুখস্ত করতে পারে। সুতরাং আমাদের উচিত আমাদের কর্মক্ষেত্রে আসা যাওয়ার সময়টির সদ্ব্যবহার করা।

(৫) প্রশ্নঃ আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে সরকারের আইন দিয়ে শাসনের ব্যাপারে আমাদের অবস্থান কি হওয়া উচিত, যেহেতু বর্তমানে আল্লাহর কিতাবের প্রয়োগ হচ্ছে না, আর চার্চ ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণের প্রচেস্টার বিশ্বায়ন ঘটছে ?

উত্তরঃ আল্লাহর কিতাবই আমাদের আইন, আর এটি আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে – সামাজিক,অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে প্রভাবিত করবে। কুরআন এমন একটি কিতাব যা আমাদেরকে জীবনযাপনের পথ দেখিয়ে দেয়,এই কিতাব কেবলমাত্র আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি এমনই এক ব্যাপার যে, এটি সাথে নিয়ে এটির জন্য আমাদের এখন সংগ্রাম করে যেতে হবে, যেমনটি আপনি বললেন যে আল্লাহর কিতাবের প্রয়োগ হচ্ছে না।

আর একই সাথে আমরা কোন বলির পাঁঠা খুঁজে তার উপর দোষ চাপিয়ে দিতে চাই না। আমি কেবল মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলোকেই আবশ্যকভাবে সমস্যা হিসেবে দেখতে চাই না। মুসলিম বিশ্বের সরকারগুলো তো আমরাই তৈরি করেছি। আপনাদের পরিস্থিতিই নির্ধারণ করে দিবে আপনাদের শাসকদের পরিস্থিতি। আমরা যদি এদের থেকে অধিকতর ভালো কিছু আশা করি তবে আল্লাহ আমাদেরকে এই অত্যাচারী সরকার দিয়ে শাস্তি দিবেন না, কারণ আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহ অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং ব্যক্তি হিসেবে আমাদেরকে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। হ্যা,সবাইকেই দাওয়াহ করতে হবে কিন্তু একই সাথে কুরআন প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাদের নিজেদের জীবনে,আমাদের পরিবারে, আর পুরো সমাজ ও সরকার ব্যবস্থায় আমাদের দাওয়া ছড়িয়ে দিতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যে আল্লাহর আইনেরই প্রভাব বিস্তার করা দরকার।

(৬) প্রশ্নঃ সোমালিয়াতে আমরা কুরআন মুখস্ত করি আর আরবিও পড়তে পারি, কিন্তু আমরা আরবিতে যা পড়ছি তা বুঝতে পারি না। এ ধরণের পরিস্থিতির ব্যাপারে আপনি কি পরামর্শ দিবেন?

উত্তরঃ আপনার ভাষায় পাওয়া যায় বা আপনি জানেন এমন কোন ভাষায় রেফারেন্স পেলে তা ব্যবহার করতে পারেন, আর আরবি শেখার চেষ্টাও করে যেতে পারেন, কারণ ইতিমধ্যেই আপনার মধ্যে আরবি বর্ণমালা শেখার ও পড়ার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, আর এটি তো অনেক বড় একটা কৃতিত্ব। আমরা যে আরবি বর্ণমালাগুলো পড়ি সেগুলো একটি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং আরবি বর্ণমালা পড়তে ও লিখতে পারা হলো প্রথম ধাপ। আরবি ব্যাকরণ ও শব্দতালিকা জানার জন্য এটি দরকার। কিন্তু কুরআন অনুধাবনের জন্য কারো উচিত হবে না আরবি শেখার আগ পর্যন্ত অপেক্ষা করা। এরপরও আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে এবং আমাদের জানা ভাষাতে আমরা যা কিছু পড়তে পারি সেগুলো পড়তে হবে যাতে করে আমরা যতদূর সম্ভব কুরআন অনুধাবন করতে পারি।

(৭) প্রশ্নঃ ইবন তাইমিয়াহ'র সেই বক্তব্যের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছিলাম, যেখানে তিনি বলেছিলেন যে, যদি কেউ আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোন বিধান দিয়ে শাসন করে তবে সে কাফির।

উত্তরঃ আপনি ইবন তাইমিয়াহ (রহ.) এর যে মতামতটি উল্লেখ করলেন, সেটি তো প্রত্যেক জ্ঞানী মুসলিম আলিমদেরই মতামত যে, কেউ যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী শাসন না করে তবে সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায়। এটি এমনই এক ইস্যু যে ব্যাপারে আর কোন বিতর্কেরই অবকাশ নেই।

আপনার প্রশ্ন হলো, এই ধরনের মুসলিম সরকারগুলোর সাথে কিভাবে আচরন করা উচিত। প্রত্যেকটা সম্প্রদায় তাদের নিজেদের ইস্যু সামলায়,এটি গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলিম হিসেবে আমাদের সেসব ইস্যু নিয়ে কাজ করতে হবে, যেগুলো উম্মাহ'র সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ইস্যু ও প্রয়োজনীয় (যেমন – এখানকার দাওয়াহ ও এখানকার মুসলিমদের জন্য এখানে প্রতিষ্ঠান তৈরি করা), সেগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে। আপনি যদি কোন মুসলিম দেশে বাস করেন, তবে জবাবটি ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু আমাদের উচিত হবে না

আফগানিস্তান,মিশর বা অন্য কোন দেশে কারো কি অমুক কাজ করাটি উচিত হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে কোন অনুমান বা ধারনা করা, কারণ মুসলিম হিসেবে আমরা সে স্থানে সে পরিস্থিতিতে নেই। আমাদের উচিত হবে নিজেদের সম্প্রদায়ের দিকে নজর দেওয়া, আর এটি করা প্রয়োজন, কারণ সে স্থানগুলোর প্রয়োজনগুলো দেখভাল করার জন্য সেখানে মুসলিমরা রয়েছেন।

ব্যাপারটি কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝানোর জন্য একটি ঘটনা বলছি। একজন ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে এসে উমার ইবন আল-খাত্তাব (রাঃ) কে বললেন,"আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই," আর লোকটি তার প্রশ্ন জানালো। উমার (রাঃ) জানতে চাইলেন, "আপনি যেটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন তা কি আসলেই ঘটেছে ?" লোকটি জবাব দিলেন,"না।" উমার (রাঃ) বললেন, "আপনি ইয়েমেনে ফিরে যান, আর আপনি আসবেন এটি ঘটবার পর আসবেন। তখন আমি আপনার জন্য বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করা সব সাহাবীদের একত্রিত করে তাদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করবো, এরপর সে ব্যাপারে আপনাকে জবাব দিবো।"

এই ঘটনা থেকে আমরা দুটো বিষয় শিখতে পারি –

(১) উমার (রাঃ) কাল্পনিক কিছুর পিছে সময় নষ্ট করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যদি আমাদের সাথে ঘটনাটি সম্পর্কিত থাকে তবে আমরা সে ব্যাপারটি দেখবো, আর যদি সম্পর্কিত না হয়, তবে সেটি সম্পর্কিত হওয়ার পরই সে ব্যাপারে আমরা হাত দিবো, এর আগে নয়।

(২) ফাতওয়া দেওয়া কোন সহজ ব্যাপার নয়, আর উমার (রাঃ) এর মতো একজন আলিম এ কথা বলেন নি যে, "আমি তোমাকে জবাব দিবো," বরং তিনি বললেন আমি আপনার জন্য বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করা সব সাহাবীদের একত্রিত করে তাদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা করবো, এরপর সে ব্যাপারে আপনাকে জবাব দিবো।"

মুসলিম দেশের সরকারগুলো যা করছে তা অবশ্যই দুর্নীতি ও মিথ্যা,তারা উম্মাহকে ভুল পথে চালিত করছে আর পথভ্রষ্ট করছে। কিন্তু আমাদের সমস্যাগুলোর দেখাশুনা করা দরকার। আমরা প্রধানত অমুসলিম সমাজে বাস করছি। আমাদের নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বাধীনতা রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন

এর কি পরিমান আমাদের থাকবে অথবা কতদিন ধরে এটি চলতে থাকবে, কিন্তু আমাদের কিছু তো আছে। আমাদের স্বাধীনতা আছে কোন প্রতিষ্ঠান গঠন ও সংগঠিত করার, কিন্তু আমরা এটি করছি না।

এখনও আমরা এমন সব ইস্যু নিয়ে লেগে আছি যেগুলোর ব্যাপারে অনেক আগেই আমাদের হাত দেওয়া উচিত ছিলো। বন্ধক রাখার ইস্যুটির ব্যাপারে এখন আমরা জিজ্ঞেস করেই যাচ্ছি। কেন এমনটি ঘটছে যে আমরা এমন কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করছি না যেটা কিনা মুসলিমদের হালাল অর্থায়নের যোগান দিবে? কেন এমনটি ঘটছে যে এখনও আমরা হালাল-হারাম মাংসের ব্যাপারটি নিয়ে লেগেই আছি, আর এই ব্যাপারে কেনই বা আমরা আগে থেকে কোন পদক্ষেপ গ্রহন করি নি? ইস্যুগুলো বারবার আমাদের সামনে চলে আসছে, সংগঠিত করা আর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কাজ করার সক্ষমতা এবং এই সমস্যাগুলোর দেখভাল করার ক্ষমতা এই উম্মাহ'র আছে,তবে আমরা তা করছি না, কেন? কারণ আমরা কাল্পনিক কিছু সমস্যার পিছে লেগে আছি আর আমাদের বর্তমান সমস্যাগুলোর কোন পরোয়া করছি না।

বার্নার্ড লুইসের একটি উক্তি হলো,"যখন কোন সম্প্রদায় সমস্যাগ্রস্ত হয়, তখন সেটির ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য দুটো উপায় আছে – (১) প্রথমে জানতে হবে আমাদের সাথে কে এমনটি করলো? (২) এরপর জানতে হবে আমাদের সাথে কেন এমনটি ঘটলো? যদি লোকেরা জানতে চায় যে 'আমাদের সাথে কে এমনটি করল', তবে তারা তাদের সেই শত্রু খোঁজা শুরু করবে যাতে করে তাদের নিজেদের সমস্যা ধামাচাপা দিয়ে শত্রুর নিন্দা করতে পারে। কিন্তু যদি তারা নিজেদেরকে এই প্রশ্ন করে – 'আমাদের সাথে কেন এমনটি ঘটলো', তবে তারা তাদের নিজেদের দুর্বলতা দেখার সমাপ্তি টেনে তাদের সাথে যা ঘটছে সেটির সমাধান খোঁজা শুরু করবে।"

পাশ্চাত্যে বাসকারী মুসলিম সম্প্রদায় হিসেবে আমি মনে করি, আমাদের ইস্যুগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে যত্নবান হতে হবে, এবং আল্লাহ আমাদেরকে যে সম্পদ,দক্ষতা,জ্ঞান দিয়েছেন আর এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু দেখাশুনার ব্যাপারে এখানে আমাদের যে সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা আছে, সেগুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

হে আমার ভাই ও বোনেরা,দাওয়াহ করার মাধ্যমে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়া ছিলো আম্বিয়াদের একটি বড় ভুমিকা। আমেরিকাতে ছয় থেকে আট মিলিয়ন মুসলিম রয়েছে। আপনি আমেরিকার অমুসলিম লোকদের উপর একটি জরিপ করে দেখতে পারেন, যার ফলাফল হবে এই যে তাদের মধ্যে নব্বই শতাংশ অথবা এর বেশী লোকের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান খুবই কম আছে, অথবা কোন জ্ঞানই নেই। আমরা আসলে কি করছি? রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) একাই মক্কায় দাওয়াহ করতেন, এরপর এটি পুরো বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং আমাদের সামনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, যেগুলোর ব্যাপারে আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে। আমাদেরকে আল্লাহর বানী বহন করতে হবে।

দাওয়ার ক্ষেত্রে নবী রসূলদের পদ্ধতি ছিলো এই যে তারা তাদের নিজ সম্প্রদায়ের আসল সমস্যাগুলোর সাথে মোকাবিলা করতেন, আর এই কাজটা খুবই কঠিন। আপনি যখন মানুষদের ভুলগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন, তখন তারা সেটি পছন্দ করবে না। এর থেকে সবচেয়ে সহজ আর সুবিধাজনক হলো কারো সমস্যা সম্পর্কে কথা বলা যেটা কিনা মানুষেরা শুনতে পছন্দ করে। আমি যদি এখন দাঁড়িয়ে মুসলিম সরকারগুলোর কুফরের ব্যাপারে খুৎবা দেই তবে মানুষেরা এটি শুনতে পছন্দ করবে। আমি যদি আমেরিকাতে এরকম কোন খুৎবা দেই তবে মানুষেরা এটি পছন্দ করবে আর এটি করাও খুব সহজ। আমি দাঁড়িয়ে বলতে পারি,"ঐসকল রাজা আর প্রেসিডেন্ট সবাই কাফির," – এটি করা সহজ, কিন্তু এতে মানুষদের কি লাভ হবে? কিন্তু আমি যদি কোন সমাবেশে তাদের সমস্যার কথা বলি,যার ফলে কোন একজন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে অপছন্দনীয় হয়ে পড়ে, তবে তারা এটি শুনতে পছন্দ করবে না। আমরা পছন্দ করি বা না করি,এটিই ছিলো নবী রসূলদের দাওয়ার পদ্ধতি।

লুত (আঃ) তার জাতিকে সেটিই বলতে পারতেন যা বলেছিলেন শুয়াইব (আঃ) – "কেন আপনারা ব্যবসার ক্ষেত্রে ন্যায্য নন ?" মাদিয়ানের লোকদের দিকে দেখুন,যারা তাদের ব্যবসার কাজে প্রতারণা করতো। লুত (আঃ) খুবই জনপ্রিয় হতেন যদি তিনি তার জাতিকে এরকম কিছু বলতেন, কারণ এটি বলার মাধ্যমে তাদের প্রতিবেশী দেশের খারাপ পরিনতি জানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি সেটি করলেন না,তিনি তাদেরকে এমন কিছু সম্পর্কে বললেন যা তারা শুনতেই চাইতো

না,সেটি ছিলো তাদের বিকৃতি সম্পর্কে। তিনি তাদেরকে বলেছেন সমকামিতা সম্পর্কে ও এর মন্দ পরিনাম সম্পর্কে, আর তারা এটি শুনতে চায় নি।

শুয়াইব (আঃ) তার জাতিকে ব্যভিচার ও অবৈধ যৌন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলেন নি। তিনি তার জাতিকে তাদের ব্যবসায় মন্দ লেনদেনের ব্যাপারে বলেছেন। লোকেরা তার কথা শুনে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। তারা বলল,"ব্যবসার সাথে তোমার ইবাদত আর ধর্মের কি-ই বা করার আছে? তুমি কেন শুধুমাত্র আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে কথা বলছো না? তুমি ব্যবসা করবে কিভাবে?" – এটি হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের একটি পুরনো রূপ। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত কোন মতবাদ নয়, এটি শুয়াইব (আঃ) এর সময় থেকে চলে আসছে। শুয়াইব (আঃ) এর জাতির লোকেরা তাকে বলেছিলো ধর্ম থেকে ব্যবসা পৃথক রাখার জন্য।

(৮) প্রশ্নঃ কুরআনের আয়াত বাসায়, দেওয়ালে, মসজিদে ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখার বিধান সম্পর্কে জানাবেন কি? আমি শুনেছি এটি করাটা বেমানান, এটি কি সত্যি?

উত্তরঃ আমার জানা নেই যে এটি বেমানান। আমি মনে করি আপনি যে কারনে এটি শুনেছেন সেটি হলো আমাদের আলোচনায় যা বলা হয়েছে সেটির কারনে,আমরা বলেছিলাম এটি হলো প্রতীকী। কিন্তু কুরআনকে উপকারের কাজে ব্যবহার করতে হবে,কেবল প্রদর্শনের জন্য কুরআন ব্যবহার করা উচিত নয়।

(৯) প্রশ্নঃ কুরআন তিলাওয়াত করতে ইচ্ছুক একজন অনারব শিশু (৪ বছর বয়স) কুরআন তিলাওয়াত করার সময় আয়াতগুলো মিশিয়ে ফেলছে,তার ব্যাপারে অনারব অভিভাবকের কি করা উচিত হবে? শিশুকে নিরুৎসাহিত না করেই কিভাবে তাকে এটি করা থেকে থামিয়ে রাখা যাবে ?

উত্তরঃ আমি মনে করি এর জবাবটি সহজ। আপনার শিশুকে বলতে পারেন,"এগুলো হচ্ছে আল্লাহর কথা, আর এই কথাগুলো নিয়ে তোমার এমন করাটা ঠিক হচ্ছে না। তুমি আল্লাহর এই কথাগুলো যেমন খুশি সেভাবে উচ্চারন করতে পারো না। তুমি যদি না জেনে থাকো, তবে এতে লজ্জার কিছু নেই যে তোমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করা দরকার।"

আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে সৎ থেকে তাদেরকে শিক্ষা গ্রহন করতে দিন,তারা যদি আয়াত না জানে তবে তাদেরকে থেমে সেটির ব্যাপারে সাহায্য চাওয়ার জন্য বলুন। যেসব শিশুরা দায়িত্বশীলতার বয়সে পৌঁছায় নি,তাদের কুরআন তিলাওয়াতের পদ্ধতি দেখে আমাদের খুব বেশী খুঁতখুঁতে হলে চলবে না। আমাদের উচিত হবে তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমাদের সেরাটাই চেষ্টা করা।

তারা ভুল করতেই পারে, আর আমি বলবো এটা তো রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এ হাদিসের ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্য – এক ব্যক্তি তার উট হারিয়ে ফেললো। সে তার উট খোঁজা শুরু করলো। সে মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো, কারণ মরুভূমির মধ্যবর্তী জায়গায় তার উট হারিয়ে ফেলার মাধ্যমে তার পরিবহন আর সম্পদ চলে গেলো। এরপর তার উট তার কাছে ফিরে আসলে সে আনন্দের আতিশয্যে আল্লাহ্*কে বলে উঠলো,"আপনি আমার গোলাম আর আমি আপনার রব।" অথচ তার তো বলার কথা ছিলো "আমি আপনার গোলাম আর আপনি আমার রব।" সে এমন একটি ভুল করলো যা একটি শিরক। রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,"এই ব্যক্তির উট ফিরে আসার পর সে যেমন খুশি হয়েছে,আল্লাহ তার বান্দার তাওবা করার কারনে তার থেকেও বেশী খুশি হোন।" সুতরাং কোন শিশু কুরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে ভুল করলে তাদেরকে সংশোধন করে দিতে হবে, আর এই ভুলটা যে কঠিন একটি ভুল, সেটি তাদের বুঝাতে হবে, কিন্তু তাদেরকে কখনোই কুরআন তিলাওয়াতে নিরুৎসাহিত করা যাবে না।

(১০) প্রশ্নঃ কুরআন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার আর সেগুলো আমাদের জীবনে প্রয়োগ করার ধাপগুলো কি কি? এ ব্যাপারে আমরা কিভাবে এগুবো?

উত্তরঃ প্রথমে আপনাকে কুরআন সঠিকভাবে অনুধাবনের ব্যাপারে নিয়্যত ঠিক করতে হবে, যা কিনা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপ। আল্লাহর কিতাব বুঝে বুঝে তিলাওয়াতের সিদ্ধান্ত ও নিয়্যত হলো অনেক একটি বড় ধাপ – "হে আল্লাহ,আমি আপনার কিতাবটি অনুধাবন করতে চাই, আর আমি সেটি করতে যাচ্ছি," এটি আপনার জন্য দরজা খুলে দিবে। কারণ আমাদের বুঝের পিছনে কিছু অপরিহার্য ব্যাপার রয়েছে, যেহেতু এটি আল্লাহর বানী। আল্লাহ বলেছেন,"আল্লাহ্*কে ভয় করো,আল্লাহ তোমাকে শিক্ষা দিবেন।" আমাদের

মধ্যে যখন তাকওয়া আসবে তখন আল্লাহ আমাদের অন্তরগুলো উন্মুক্ত করে দিবেন আর তার জ্ঞান থেকে আমাদের নূর দান করবেন।

দ্বিতীয়ত,আমরা যখন কুরআন তিলাওয়াত করবো,তখন সূরা,জুয বা কুরআন শেষ করার দিকে আমাদের মনোযোগ দিবো না, বরং আমাদের মনোযোগ থাকবে আমরা যা তিলাওয়াত করছি সেটির দিকেই। ইবন সাউদি বলেছেন,"যখন তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো, তখন তোমাদের এমনভাবে তিলাওয়াত করা উচিত হবে না যেন তোমরা সবজি বিক্রি করছো (সবজি বিক্রেতা সবজি বিক্রি করার সময় চিন্তা করতে থাকে যে কখন তার সব সবজি বিক্রি করা শেষ হবে) – কুরআনের সাথে তোমাদের এভাবে আচরন করাটা উচিত হবে না। তোমরা যে আয়াতগুলো তিলাওয়াত করবে, কেবল সেগুলোর ব্যাপারেই তোমাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত হবে।"

তৃতীয়ত, অবিরতভাবে তিলাওয়াত করা,সবসময় তিলাওয়াত করা। আল্লাহর কিতাব বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করা হয় নি (যেমন একটি অধ্যায় কাহিনী সম্পর্কে,একটি অধ্যায় আইন সম্পর্কে ইত্যাদি)। সবকিছুই একসাথে করা হয়েছে। উদাহারন হিসেবে সূরা তালাক থেকে একটি আয়াত দেখি,সেই আয়াতে পারিবারিক আইন ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রের ব্যাপারে বলা হয়েছে। আপনি যখন সবসময়ই কুরআনের কাছেই থাকবেন,আপনি তিলাওয়াত করার সময় এমন কিছু পাবেন যেন সেটি আপনাকেই উদ্দেশ্য করে বলছে। এর কারণ হলো আল্লাহর কিতাব আপনার সাথে কথা বলছে। কুরআনের সাথে আপনার একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে,আল্লাহই ভালো জানেন। এটি প্রায়ই লোকদের ক্ষেত্রে ঘটে যে, যখন তারা কোন বিশেষ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যান, সে পরিস্থিতে তারা কোন নির্দিষ্ট আয়াত তিলাওয়াত করেন।

কিছু সাহাবীর ক্ষেত্রে ও এমনটি ঘটেছিলো যখন এই আয়াত নাযিল হলো – "ইমানদারদের জন্য কি এখনও সে সময়টি আসেনি যে আল্লাহর (আযাবের) স্মরণে আর আল্লাহ যে সঠিক (কিতাব) নাযিল করেছেন তার স্মরণে তাদের অন্তরসগুলো বিগলিত হয়ে যাবে ..." (সূরাহ হাদিদ,৫৭ : ১৬) – তখন কিছু সাহাবী এই আয়াত শুনে বিস্মিত হলেন, কারণ তার মনে করেছিলেন যে তারা ইতিমধ্যেই ঈমানদার বান্দা, কিন্তু তারা জানতেন না যে এমনকি তাদের জন্যও

এটি মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন আছে,যা আল্লাহ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে তাদের মনে করিয়ে দিলেন। আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

(১১) প্রশ্নঃ অমুসলিমরা অপবিত্র থাকার পরও কি তাদেরকে কুরআনের অনুবাদ দেওয়া যাবে?

উত্তরঃ প্রথমত,আমাদের এখানের (পাশ্চাত্যের) পরিস্থিতিতে এ ব্যাপারে আমরা এমন সব লোকদের মুখোমুখি হয়েছি যারা ইংলিশে কুরআন পড়েন, আর এটিকে তো কুরআন হিসেবে বিবেচনা করা হয় না (অনুবাদকের নোটঃ বরং একে কুরআনের অনুবাদ বলা হয়, কুরআনের অনুবাদই কুরআন নয়)। সুতরাং কুরআনের ব্যাপারে যেসব বিধান আছে তা এখানে খাটছে না। আপনি যদি তাদেরকে কুরআনের এমন কপি দেন যেটাতে আরবি আছে, তবে আমি যে ফিকহের মতামতটির অনুসরণ করি সে অনুসারে বলতে পারি, যদি কপিটির বেশীরভাগ অংশই এর তাফসীর বা অনুবাদ হয়ে থাকে, তবে সেটিকে মুসহাফ (কুরআনের লিখিত রূপ) বলা যাবে না।

উদাহারন হিসেবে বলা যায়,আমরা যদি এমন প্রতিটি জিনিষ – যেগুলোতে আল্লাহর আয়াত লিপিবদ্ধ করা আছে, সেগুলোর উপর তাহারাতের (পবিত্রতার) বিধান প্রয়োগ করি, তবে তাফসীরের প্রতিটি কিতাব,আরবিতে রচিত অনেক কিতাব আর প্রতিটি আরবি সংবাদপত্র যেগুলোতে সাধারণত কুরআনের একটি আয়াত থাকে –এগুলো স্পর্শ করার পূর্বে কি আমাদেরকে ওযু করে নিতে হবে ? না,যতক্ষন না পর্যন্ত এগুলোর অর্ধেকের বেশী অংশে আল্লাহ কিতাবের আয়াত দেখা যাবে না, ততক্ষন পর্যন্ত একে কুরআন হিসেবে গণনা করা যাবে না। এর থেকে ভালো একটি বিকল্প আছে, সেটি হলো তাদেরকে কুরআনের এমন অনুবাদ দেওয়া, যেটাতে আরবিতে আয়াত নেই,আর এটি বর্তমানে সহজলভ্য।

সূত্রঃ Black Flag Series in Bangla

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪১৯৬

আকাবিরের বাণী : কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত ও তাদাব্বুর

abudujanah

Senior Member

০২-২২-২০১৯

١* - كان عثمان ﷺ يقول* :* لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عزوجل.

০১- হযরত উসমান রাযি. বলতেন, যদি আমাদের অন্তর যথাযথ পরিশুদ্ধ হতো তাহলে আল্লাহর কালাম দ্বারা অন্তর কখনোই তৃপ্তি লাভ করতো না। -সীরাত উসমান বিন আফফান রাযি., মুহাম্মদ আলী সাল্লাবী : ২৫

٢ - تفقَّدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء : في الصلاة ، وفي الذِّكر ، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وإلاَّ فاعلموا أن الطريق مُغلق . الحسن البصري رحمه الله

০২ - তিনটি জিনিসে স্বাদ তালাশ করুন। নামাযে, যিকিরে এবং কোরআন তেলাওয়াতে। যদি পান তাহলে তো ভালো। যদি না পান তাহলে মনে রাখুন, আপনার জন্য রাস্তা এখনো বন্ধ।

-হযরত হাসান বসরী রহ.

٣ - إن من كانوا قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل، وينفذونها في النهار

-الإمام الحسن البصري رحمه الله

০৩ - তোমাদের পূর্বে যাঁরা ছিলেন (সাহাবায়ে কেরাম রাযি.) তাঁরা কুরআনকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বা চিঠি মনে করতেন। তাঁরা রাতের বেলা গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করতেন আর দিনের বেলা সে মোতাবেক আমল করতেন।

- হযরত হাসান বসরী রহ.

•·····•

٤ - كان قتادة رحمه الله تعالى يقول : اعمروا به قلوبكم واعمروا به بيوتكم يعني بالقرآن.

০৪ - কোরআন দ্বারা তোমরা তোমাদের অন্তর ও গৃহ দু'টোকেই আবাদ করো।

-হযরত কাতাদাহ রহ.

٥ - قَالَ ابنُ تَيمية رَحِمه اللهِ : قِراءَةُ القُرآنِ عَلى الوجَهِ المَأمُورِ بِهِ تُورِثُ القلب الإيمَان العَظِيم تزيده يَقِينًا وطُمَأنِينَةً وشِفَاءً . مجموع الفتَاوى : ٧/٢٨٣

০৫ - যথাযথভাবে কোরআন তেলাওয়াত করা হলে এর দ্বারা অন্তরে ঈমান, ইয়াকিন এবং প্রশান্তি বৃদ্ধি পায় এবং এর মাধ্যমে অন্তরের ব্যাধিসমূহ থেকে সুস্থতা লাভ হয়।

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.; মাজমূউল ফাতাওয়া : ৭/২৮৩

٦ -*من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق

-شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

০৬ - যে ব্যক্তি কোরআন থেকে হেদায়েত গ্রহণের উদ্দেশ্যে গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করে তার সামনে 'হক রাস্তা' স্পষ্ট হয়ে যায়।
-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ.

০৭ - কোনো বান্দার জন্য গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে কোরআন তেলাওয়াত করা অপেক্ষা দুনিয়া ও আখেরাতে অধিক উপকারী এবং নাজাতের জন্য অধিক সহায়ক আর কিছু নেই।

-ইমাম ইবনুল কাইয়িম রহ.; মাদারিজুস সালিকীন : ১/৮৫

০৮ - কোরআন বুঝার ক্ষেত্রে অন্যতম বাধা হল, গুনাহ, (বিশেষত) অহংকার ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। এসবের কারণে অন্তরে অন্ধকার সৃষ্টি হয় এবং জং ধরে যায়।

-আল্লামা ইবনে কুদামা মাকদিসী রহ.; মুখতাসারু মিনহাজিল কাসিদীন : ১/৫৩

০৯ - কেউ কোরআন শেখার পর যদি তা ভুলে যায় তাহলে নিশ্চিত এটা তার গুনাহেরই ফল। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

***وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ**

তোমাদের উপর যে মসিবতই আসে তা তোমাদেরই কর্মফল।-সূরা শুরা : ৩০ কোরআন ভুলে যাওয়ার চেয়ে বড় মসিবত আর কী হতে পারে ?

-ইমাম যাহহাক বিন মুযাহিম রহ.

١٠ - قال الضياء المقدسي : أوصاني العماد المقدسي فقال : أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ ، قال : فرأيت ذلك وجربته كثيراً فكنت إذا قرأت كثيراً تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي . ذيل طبقات الحنابلة : ٢٠٥/٣

১০ - একবার শাইখ ইমাদুদ্দিন মাকদিসি রহ. আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন, (প্রতিদিন) বেশি পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করবে। কিছুতেই যেন তেলাওয়াত না ছুটে। কারণ, তুমি যা অন্বেষণ করছো তা তোমার জন্য সেই পরিমাণ সহজ হবে যেই পরিমাণ তুমি কোরআন তেলাওয়াত করবে। (বেশি হলে বেশি। কম হলে কম) এরপর আমি বহুবার পরিক্ষা করে দেখেছি যে, যখনই তেলাওয়াত বেশি করতাম তখন বেশি পরিমাণে হাদিস শোনা ও লেখা আমার জন্য সহজ হতো। আর যখন তেলাওয়াত না করতাম (বা কম করতাম) তখন হাদিস শোনা ও লেখা ওরকম সহজ হতো না।

-শাইখ জিয়াউদ্দিন মাকদিসি রহ.

١١* - ﴿ ٱلرَّحْمَٰنُ (١) عَلَّمَ ٱلْقُرْءَان ﴾

***لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ السُّورَةُ لِتَعْدَادِ نِعَمِهِ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَى عِبَادَه قَدَّمَ النِّعْمَةَ الَّتِي هِيَ أَجَلُهَا قَدْرًا ، وَأَكْثَرُهَا نَفْعًا ، وَأَتَمُّهَا فائدة ، وَأَعْظَمَهَا عائدة : وَهِيَ نِعْمَةُ تَعْلِيمِ**

القُرآن.

فَإنهَا مَدَارَسَعَادَةِ الدَّارَيْنِ ، وَقُطْب رَحَى الخَيْرَيْنِ ، وَعِمَاد الأَمْرَيْنِ

-الإمَّام الشّوكَانِي رحمه الله تعالى

১১- করুনাময় আল্লাহ। তিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সূরা আর রহমান :১-৩

আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে যতো নেয়ামত দিয়েছেন এ সূরায় (সূরা আর রহমানে) তিনি তা উল্লেখ করেছেন। ওসব নেয়ামতের মধ্যে যে নেয়ামতটি সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে উপকারী, যার উপকারিতা পূর্নাংগ ও ব্যাপক তা হল, কোরআন শিক্ষা দানের নেয়ামত। এ নেয়ামতের কথা তিনি অন্য সব নেয়ামতের আগে (সূরার একদম শুরুতে এমনকি মানুষকে সৃষ্টি করার কথা বলারও আগে) উল্লেখ করেছেন। এর কারণ, এ নেয়ামতটিই হল ইহকাল ও পরকালের সৌভাগ্যের মূলভিত্তি এবং উভয় জগতের কল্যাণের বুনিয়াদ ও কেন্দ্রবিন্দু। - ইমাম শাওকানী রহ.

١٢ - كان ابن هبيرة رحمه الله يقول : من مكائد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى و اقع عند التدبر. ذيل طبقات الحنابلة

১২ : কোরআনে কারীমের তাদাব্বুর (বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তাভাবনা) করা থেকে আল্লাহর বান্দাদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা শয়তানের একটি চক্রান্ত। কারণ, সে জানে কুরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে তারা হেদায়েত পেয়ে যাবে।

-হযরত ইবনে হুবায়রা রহ.; যাইলু তাবাকাতিল হানাবেলা

١٣ - قال ابن رجب* الحنبلي رحمه الله : أعظم ما تحصل به محبة الله من النو افل : تلاوة القرآن ، خصوصا مع التدبر *

مجموع الرسائل ٤/٨٧

১৩ : নফল আমলের মধ্যে যে আমল দ্বারা আল্লাহর মহব্বত সবচে' বেশি লাভ হয় তা হল, কোরআন তেলাওয়াত। বিশেষ করে যখন তা হয় গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে।

- ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রহ., মাজমুউর রাসায়েল : ৪/৮৭

১৪ - আমি প্রথমে নিজেকে এরপর আপনাদের সবাইকে একটি উপদেশ দিচ্ছি। তা হল, প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করুন এবং অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করুন এবং কোরআনের বিষয়বস্তু নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করুন। বিশেষ করে জেহাদ বিষয়ক সূরাগুলো- যেমন সূরা আনফাল, সূরা তওবা ইত্যাদি- গভীর চিন্তা ভাবনার সাথে তেলাওয়াত করুন। এর পাশাপাশি আযকার ও দোয়া কোনও অবস্থাতেই যেন না ছুটে।

-মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

১৫ - আমি আমার মুসলিম ভাই-বোনদের খেদমতে আরয করব, অন্তরে ঈমান মজবুত করা এবং সব ধরনের ফিতনা থেকে, (বিশেষ করে) নেফাক থেকে নিরাপদ থাকার জন্য আমাদের জিহবা যেন সব সময় আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে। এ উদ্দেশ্যে আমরা প্রতিদিন (অর্থ বুঝে) চিন্তা ভাবনার সাথে কমপক্ষে এক পারা কোরআন তেলাওয়াত করবো। এর দ্বারা আমাদের অন্তর আলোকিত হবে এবং বিবেক বুদ্ধি শানিত হবে। (চিন্তা ভাবনার সাথে) কোরআন তেলাওয়াতের দ্বারা আমাদের এমন অন্তর্দৃষ্টি হাসিল হবে যা দ্বারা আমরা ইসলামের শত্রুদেরকে চিনতে পারবো। ওরা কাফের-মুশরিক হোক কিংবা (মুসলিম নামধারী) মুনাফিক হোক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ.

হে লোক সকল! তোমাদের কাছে তোমাদের পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে উপদেশবানী এসেছে এবং অন্তরের রোগের নিরাময় এবং মুমিনদের জন্য হেদায়েত ও রহমত। সূরা ইউনুস : ৫৭

-মুহসিনুল উম্মাহ শহীদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রহ.

১৬ - যারা খেলাফতের গুরু দায়িত্ব বহন করতে চায় তাদের জন্য দুটি আমল অবশ্য কর্তব্য। একটি হল, তাহাজ্জুদের নামাজ। দ্বিতীয়টি হল, বেশি বেশি কোরআন তেলাওয়াত।

-মাওলানা আসেম উমর হাফি.

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৪৯৯

তাবলিগ প্রসঙ্গ (এক)

ibn masud

Junior Member

০৬-২৯-২০১৯

তাবলিগ ও চলমান তাবলিগী জামাতের আলোচনা নতুন কোনো বিষয় নয়। এ শব্দ দুটির সাথে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এ শব্দদয়ের শাব্দিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমাদের সকলেরই কম বেশি জানা। প্রয়োজন হলো তাবলিগ নামক শরয়ি পরিভাষাটির সত্যিকার রূপরেখা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা লাভ করা। যাতে মিথ্যার প্রলেপ থেকে ইসলামের এই পরিভাষাটিকে সংরক্ষণ করা যায়। যাতে হিতাহিত জ্ঞানহীন অতি উৎসাহিত গুটিকতেক লোকের মিথ্যা্ প্রলাপ হতে বেঁচে থাকা যায়। যারা কিছু মুখস্ত বুলি আওড়িয়ে আজ কুরআনের অনেক বাস্তবতা হতে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছে। যারা আজ আল্লাহর কোরআনের উপর গুটি কতেক কিতাব ও রচনাকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

একটি বিষয় আমাদের ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত যে, আমরা মানুষ, আর মানুষ হিসাবে মানবিক দুর্বলতা আমাদের মধ্যে থাকতেই পাড়ে? নীতি ও আদর্শের বাহিরে গিয়ে আমরা অনেক কিছুই করে থাকি। কিন্তু আসমান জমিনের অধিপতি মহামহীয়ান আল্লাহ মানবিক দুর্বলতা কি? তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার দুর্বলতাই ক্রিয়াশীল নয় বরং তিনি সর্ব প্রকার দুর্বলতা হতে মুক্ত ও পবিত্র। লাইনচ্যুত হওয়া কিংবা আদর্শচ্যুত হওয়া আল্লাহ তায়ালার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তিনি সর্বদা তার আদেশ ও আদর্শকেই ফলো করেন। তাঁর নীতি ও আদর্শের উপরই অটল-অবিচল থাকেন। কোরআন খুললে এর অনেক দৃষ্টান্ত আমরা খুঁজে পাই। কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয়টিকে অত্যন্ত পরিস্কার ভাবেই তুলে ধরেছেন।

ইসলামের শুরুলগ্নে ইসলামের শত্রুরা ওহীর এ আলোকে নিভিয়ে ফেলতে তাদের কোনো চেষ্টায় তারা ত্রুটি করেনি। ইসলাম নামক অনন্য এ জীবনদর্শনকে তাদের খেয়াল-খুশির সাথে একাকার করে ফেলতে কোনো প্রন্থাই তারা তাদের গবেষণার বাহিরে রাখেনি। এক পর্যায় তারা মক্কায় একটি কুপ্রস্তাবের প্রোফাগান্ডা চড়িয়ে দিল। মক্কার অলিতে গলিতে তারা আপসকামিতার এক অশুভ সুর তুলল। যার

পরিপেক্ষিতে মক্কার কাফেরগণ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে এ প্রস্তাবনা পেশ করলো যে, এক বছর আমার সবাই মিলে আল্লাহর ইবাদাত করবো এবং পরবর্তী বছর আমরা সবাই মিলে মূর্তিপূজা করবো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের উল্লেখিত প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে সাথে সাথেই আয়াত নাজিল করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন: হে নবী্ আপনি বলুন যে, তোমাদের জন্যে তোমাদের ধর্ম, আর আমার জন্যে আমার ধর্ম। সূরা কাফিরূন। উক্ত আয়াতখানি এ ব্যপারে পরিস্কার যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর আদেশ ও আদর্শে একদম অটল-অবিচল।

কিন্তু আপসকামিতায় মত্ত মুসলিমজাতির কাছে এ জাতীয় প্রস্তাবনা হয়তো আজ কোনো বিষয়ই না। কারণ দীর্ঘকাল যাবৎ মুসলিমজাতি কুফূরি শক্তির জাকজমক আর সামরিক মহড়ার তেজদৃপ্তির মাঝে বসবাস করার ধরুন আজ তারা ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয়াবেসের পরিবর্তে কেবল আপসকামিতার স্বপ্নেই শুধু বিভোর রয়েছি। যে আপসকামিতা আজ আমাদের মধ্যে মহামাড়ির আকার ধারণ করেছে। যে আপসকামিতাই আজ আমাদের দ্বীনি কর্মসূচীকে কলষিত করছে। যে আপসকামিতা আজ আমাদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ম্লান করে দিচ্ছে। যে আপসকামিতাই আজ তাবলিগ নামক শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিভাষাকে শরয়ি-মানদন্ডের বাহিরে পৌঁছে দিয়েছে।

নতুবা কেন?, আজ এ পৃথিবীর খোলা আকাশের নিচে তাবলিগী কর্মসূচী নিয়ে বিচরণকারী হাজার হাজার মুবাল্লিগীনদের মধ্যে সাহাবাদের অনুরূপ আপসহীন, সত্যিকার, সত্যবাদী কোনো মুবাল্লিগ পাওয়া যায় না। কেন আজ?, তাদের মধ্যে ইমানী তেজদৃপ্তি আর অগ্নিশীখার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। কেন আজ?, তাদের মধ্যে বিশ্বমানবতাকে টেনে-হেঁচড়ে হলেও ইহকালিন-পরকালিন মুক্তির পথে নিয়ে আসার মতন যথাপোযুক্ত কোনো কর্মসূচী লক্ষ্য করা যায় না। সারা পৃথিবী আজ জালিমশাহীর শতভাগ কড়ায়েত্তে চলে যাওয়ার পরও, কেন আজ তারা তাদের বিরুদ্ধে হায়দারি হুঙ্কার পুনোরাই উচ্চারণ করে না। কেন আজ?, তারা জীবনের মোহ-মায়াকে পেছনে ফেলে হলেও সত্যকালিমার দাওয়াত নিয়ে রাজা-বাদশাহদের দার-দুয়ারে গাস্ত করে না?

অথচ আমরা জানি যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ইসলামের রূপরেখা ফেট্রিকেলি, অভিনব, মানসম্মত। ইসলাম বাহ্যিক-অভ্যতরীণ উভয় দিক থেকেই সৌন্দর্য মন্ডিত। ইসলাম লক্ষ্যে-উদ্দেশ্যে ও কর্মসূচী নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিখুত। লক্ষ্যভ্রষ্টতা কিংবা ব্যর্থকর্মসূচীর দ্বায়ভার ইসলাম গ্রহণ করতে কিছুতেই প্রস্তুত নয়। একজন মুমিন জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে লাইনচ্যুত হয়ে উদ্ভ্রান্ত পথিকের ন্যায় জীবন যাপন করুক, ইসলাম তা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ঠিব তদ্ররূপ সঙ্গবদ্ধভাবে মুমিনদের কোনো জামাত ত্রুটিযুক্ত, লক্ষ্যভ্রষ্ট কোনো কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাক, ইসলাম এরও অনুমোদ প্রদান করে না। এক কথায় ব্যক্তিগত জীবনে যেমন একজন মুমিন সুনির্দিষ্ট বিধিমালায় বিধিবদ্ধ, জামাতগত বা সামুষ্ঠিক জীবনের ক্ষেত্রেও সকল মুসলমান সুনির্দিষ্ট নীতিমালায় আবদ্ধ। কেউ চাইলেই ইসলাম ও মুসলমানদের মধ্যে কোনো জামাত তৈরি করতে পারবে না। ইচ্ছা করলেই মুসলমানরা যে কোনো জামাতের সাথে একিভূত হতে পারবে না। যেমন ইচ্ছা করলেই কেউ ইসলামিক জামাতের মৌলিক কোনো নীতিমালায় পরিবর্তন আনতে পারবে না। এক কথায় উল্লিখিত বিষয়সমূহ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক নির্ধারিত ও পূর্বাপরিকল্পিত।

তা ছাড়াও সঠিক কর্মপ্রন্থা-কর্মসূচীর দিক দিয়ে যে জাতি যতটুক সুসংহত বাহ্যিক ফলাফলের দিক দিয়ে তারা ততোবেশি উন্নত। আর তাই, সর্বাগ্রাসি কুফুরি শক্তির কাছে মুসলিম জাতির পরাজয় বরণের পর পরেই, মুসলিম জাতির সর্বিক বিজয়ের জন্যে তাদের মাঝে সঠিক কর্মপ্রন্থা ও কর্মসূচী সম্পূর্ণ একটি দাওয়াতি মিশনেরই অত্যাধিক প্রয়োজন ছিল। হাজারে হাজারে না হলেও তাদের মাঝে এমন কিছু দায়ী ও মুবাল্লিগ তৈরির প্রয়োজন ছিল, যারা সত্যিই আল্লাহর দ্বীনের একেকজন আপসহীন মুবাল্লিগ। যারা অসত্য-অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যিই শক্তিশালী এক লাঠিয়াল বাহিণী। যারা কাজে কর্মে, সব দিক দিয়েই একজন মুনিন। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই যারা আল্লাহর প্রেরিত সেই সত্যিকার খলিফার একজন বাস্তব প্রতিচ্ছবি। যারা আল্লাহর ইচ্ছা-অভিপায়কে মানুষের মাঝে দেখিয়ে যাবে, কোরবানির জন্তুর ন্যায় মরে হলেও। যারা সর্বক্ষেত্রেই ইসলামের আলোকে ছড়িয়ে দিবে, জোনাকির ন্যায় মিটিমিটিভাবে জ্বলে হলেও। যারা বিশ্বমানবতাকে জুলুমবাজ নীতি আর দর্শনের ভেড়াজাল থেকে মুক্ত করবে, অবশেষ রক্তবৃন্দুর বিনিময়ে

হলেও। যারা কুফুরি শক্তির মূলে কম্পন তৈরি করবে, নিজেদের সবটুকু শক্তি-সামথ্যের প্রয়োজনে হলেও।

কিন্তু চলমান এ তাবলিগী জামাতকে কোনো পরিমাপ যন্ত্রের মাধ্যমেই আমরা ইসলামের তাবলিগ নামক পরিভাষাটির সত্যিকার ধারক বাহক রূপে মাপতে পারি না। এ জামাতের কর্মসূচী নিয়ে পুরো পৃথিবী জুড়ে বিচরণকারী হাজার হাজার দায়ী-মুবাল্লিগদেরকে কোনো পরীক্ষার মাধ্যমেই আমরা সাহাবাদের মতন আপসহীন, সত্যিকার, সত্যবাদি মুবাল্লিগিনদের অনুরূপ দেখতে পাই না। কারণ ওহীর কালি কোরআন দ্বারা আল্লাহ তায়ালা একজন দায়ীর যে সকল গুণাবলি ও চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এর সাথে চলমান তাবলিগী জামাতের কোনো মিল আমরা খুঁজে পাই না। উদাহরণ স্বরূপ একটি অমিল এখানে আমরা তুলে ধরছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾

তরজমা: যারা আল্লাহ ভীতির সাথে আল্লাহর পয়গামসমূহ পৌঁছেয়ে দেয়, তারা শুধু আল্লাহকেই ভয় করে। আর (তাদের জন্যে) আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট। (আহযাব-৩৯)

অর্থাৎ এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা নবী-রাসূলদের একটি গুণ উল্লেখ করেছেন যে, নবী-রাসূলগণ আল্লাহ ভীতির সাথে মানুষের মাঝে আল্লাহর বাণীসমূহ পৌঁছে দিতেন। কিন্তু তারা আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে কোনো রূপ ভয় করতেন না। যা কিনা ধারাবাহিকভাবে নবী-রাসূলদের অনুসারী অনুগামীদের ক্ষেত্রেও প্রজোয্য যে, তাঁরাও যখন নবী-রাসূদের আনিত দ্বীন ও শরিয়ত মানুষদের মাঝে পৌঁছে দিবেন তখন আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই তারা ভয় পাবেন না। তা ছাড়াও আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে ভয় না করা, একজন মুমিনের অন্যতম একটি গুণ। যে গুণটি একজন দায়ীর ক্ষেত্রে আরো বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অর্থাৎ একজন দায়ী/মুবাল্লিগ কাপুরুষ ও ভীতু হবে না। বরং সৎ সাহসের অধিকারী নির্ভয় হবে। আর নির্ভয়ভাবেই আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের মাঝে পৌঁছে দিবে।

কিন্তু হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহ: কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তাবলিগ জামাতের সার্বিক ক্রিয়া-কর্ম, প্রন্থা-প্রদ্ধতি, কর্মশালা-কর্মসূচীর দিকে গভীরভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে

কিছুতেই এ জামাতের কর্মী সদস্যদের মধ্যে উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের কিদয়াংশও খুঁজে পাওয়া যায় না। কোরআনের দৃষ্টিতে যে বৈশিষ্ট্যটি একজন দায়ীর জন্যে অতীভ গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনের আলোকে যে বৈশিষ্ট্য ব্যতিত একজন দায়ীর প্রকৃত চিত্র অঙ্কন করা প্রায় অসম্ভব। আর উল্লিখিত বৈশিষ্টের অনুপস্থিতিই আজ তাদেরকে তাগুতি সমাজ ব্যবস্তার ব্যপারে কিছু বলা ও করার বিষয়টিকে নিজেদের দৃষ্টি সীমার বাহিরে রাখতে বাধ্য করেছে। যে বৈশিষ্টের অনুপস্থিতিই আজ তাদেরকে তাগুতি শক্তির সামনে বোবা শয়তানের বেস ধারণ করতে বাধ্য করেছে। যে বৈশিষ্টের শূন্যতাই আজ তাদেরকে আপসকামী কর্মসূচী হাতে নিতে প্রেরণা যোগিয়েছে। (চলবে.. ইনশাল্লাহ)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৫৭৪

দরসুল কুরআনঃ রমযানে বেশি বেশি ইবাদতের মাধ্যমে জিহাদের ইমানের প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

আদনানমারুফ

Senior Member

০৫-০৭-২০১৯

আসুন, রমযানে বেশি বেশি ইবাদতের মাধ্যমে জিহাদের ইমানী প্রস্তুতি গ্রহণ করি।

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

উপরোক্ত আয়াতসমূহে প্রথমে আল্লাহ তায়ালা বলছেন, ‘আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের থেকে তাদের জানমাল কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে, তারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে, মারবে ও মরবে, তাওরাত, ইন্‌জীল ও কুরআনে (তাদের সাথে এই) অঙ্গীকার করা হয়েছে’। ... এরপর আল্লাহ তায়ালা মুজাহিদদের কিছু গুণাবলী উল্লেখ করেছেন যে, ‘তারা তাওবাকারী, ইবাদতগুজার, (আল্লাহ তায়ালার) প্রশংসাকারী, (জিহাদ, ইলম অর্জন ইত্যাদি দ্বীনি কাজে) সফরকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজ হতে নিষেধকারী, আল্লাহ তায়ালার আদেশ-নিষেধ পালনকারী। আপনি (এমন) মুমিনদের (দুনিয়াতে বিজয় ও আখেরাতে সওয়াবের) সুসংবাদ দেন’। (সুরা তাওবা, আয়াত, ১১১-১১২)

আয়াত থেকে আমরা বিজয়ের সুসংবাদপ্রাপ্ত মুজাহিদদের কিছু গুনাবলী জানতে পারলাম, যার মধ্যে কয়েকটি গুণ হলো,

১. الْعَابِدُونَ ইবাদতগুজার, অর্থাৎ মুজাহিদগণ বেশি বেশি ইবাদত করবেন।

২. **الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ** রুকু ও সিজদাকারী, অর্থাৎ মুজাহিদগণ সর্বোত্তম ইবাদত নামাযের প্রতি যত্নবান হবেন, ওয়াক্ত মত জামাতের সাথে নামায পড়বেন, বেশি বেশি নফল নামায পড়বেন এবং কিয়ামুল লাইলে অভ্যস্ত হবেন।

৩. **الْحَامِدُونَ** আল্লাহ তায়ালা প্রশংসাকারী, অর্থাৎ তারা তাসবীহ-তাহমিদের মাধ্যমে বেশি বেশি আল্লাহ তায়ালার যিকির করবেন, আর সর্বোত্তম যিকির তো কুরআন তেলাওয়াত।

সুতরাং রমযান মাসে এ গুণাবলী অর্জন করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হওয়া উচিত, শাইখ আব্দুল কাদের **العمدة في إعداد العدة** কিতাবে ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, 'মুমিনরা যে কখনো কখনো যুদ্ধে পরাজিত হয় এর কারণ হলো তারা যুদ্ধের শর্ত ইমানী বা আসকারী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বা সামরিক প্রস্তুতিতে ত্রুটি করেছে, যদি এর কোন একটিতে ত্রুটি না হয় তাহলে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদা অনুযায়ী মুমিনরা কখনোই পরাজিত হবে না'। আল্লাহ তায়ালা বলেন, **وَ أَنْتُمُ الأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা (পূর্ণাঙ্গ) মুমিন হও (এবং ইমানের তাকাযা অনুযায়ী সামরিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি পূর্ণরুপে গ্রহণ করো)। -সুরা আলে ইমরান, আয়াত, ১৩৯

উহুদ যুদ্ধে গুনাহের কারণেই মুমিনদের পরাজয় হয়েছিলো, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا

দুই বাহিনী সম্মুখীন হবার দিন যারা পলায়ন করেছে, শয়তান তাদেরকে তাদের কিছু গুনাহের কারণেই পদস্খলিত করেছে। -সুরা আলে ইমরান, আয়াত, ১৫৫।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ

যখন তোমাদের উপর এমন আঘাত আসলো যার দ্বিগুন আঘাত তোমরা করেছিলে, তখন তোমরা বলে উঠলে, এটা কেন হলো? (অর্থাৎ আল্লাহ তো

আমাদের বিজয়ের ওয়াদা করেছেন, তাহলে আমরা কেন পরাজিত হলাম?) হে রাসূল আপনি বলুন, এটা তোমাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণে। (অর্থাৎ তোমরা রাসূলের আদেশ অমান্য করে যে অন্যায় করেছো, এর কারণেই তোমরা পরাজিত হয়েছো, নতুবা প্রথম অবস্থায় তো আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ করেছিলেন এবং তোমাদের বিজয় দান করেছিলেন, যেমনটা আল্লাহ তায়ালা অন্য আয়াতে বলেছেন, **وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ** আল্লাহ তায়ালা তোমাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, যখন তোমরা কাফেরদের হত্যা করছিলে, অতপর যখন তোমরা মতভেদ করে দূর্বল হয়ে পড়লে এবং (রাসূলের আদেশ অমান্য করে) গুনাহে লিপ্ত হলে (তখন যুদ্ধের ঘুটি পাল্টে গেল)

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য শায়েখ আব্দুল কাদের রচিত আলউমদাহ গ্রন্থের **الأصول الخمسة لتحقق سنة النصر أو تخلفها** এই অধ্যায়টি (পৃ: ২১৫-২৩৬ পৃষ্ঠা) দেখতে পারেন। এখানে শায়েখ ইমানী প্রস্তুতির গুরুত্বের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে খুবই সুন্দর আলোচনা করেছেন।

অধিকন্তু জিহাদের মতো একটি কষ্টকর ইবাদত পালন করার জন্য যথেষ্ট আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন। আর এই আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন হয় বেশি বেশি ইবাদত, বিশেষকরে দীর্ঘ কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে। শায়েখ আবু মুহাম্মদ আলমাকদিসী বলেন,

ولن يستطيع العبد مواجهة الشرك وأهله ولن يقوى على التبرؤ منهم وإظهار العداوة لباطلهم إلا بعبادة الله حق عبادته، ولقد أمر الله عز وجل نبيه محمداً ﷺ بتلاوة القرآن وقيام الليل في مكة وأعلمه بأن ذلك هو الزاد الذي يعينه على تحمل أعباء الدعوة الثقيلة وذلك قبل قوله: {إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً} [المزمل: 5]، فقال} :يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً} [المزمل: 1 - 4]، فقام صلوات الله وسلامه عليه وقام معه أصحابه حتى تفطرت أقدامهم .. إلى أن أنزل سبحانه التخفيف في آخر الآيات.

وإن هذا القيام بتلاوة آيات الله عز وجل وتدبر كلامه .. لخير زاد ومعين للداعي، يثبته ويعينه على مشاق الدعوة وعقباتها

বান্দা কখনোই শিরক ও মুশরিকদের মোকাবেলা করতে পারবে না, এবং তাদের থেকে বারাআত করতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত যথাযথভাবে করবে, আল্লাহ তায়ালা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কায় তাহাজ্জুদে কুরআন তেলাওয়াতের আদেশ দিয়েছিলেন, এবং তাকে জানিয়েছিলেন যে, এই ইবাদত দাওয়াতের গুরুদ্বায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার জন্য সহায়ক হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, ওহে চাদর আবৃত (রাসূল) আপনি রাতের কিছু অংশ ব্যতীত (পুরো সময়) ইবাদত করুন। অর্ধ রাত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম বা বেশি (সময় ইবাদত করুন) (এরপর আল্লাহ তায়ালা এই আদেশের কারণস্বরুপ বলেন) নিশ্চয়ই আমি আপনার উপর এক ভারী কথা (অর্থাৎ কুরআন) অবতীর্ণ করবো। সুরা মুযযাম্মিল, আয়াত, ১-৫

তাহাজ্জুদে কুরআন তেলাওয়াত ও আল্লাহর আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর করা হলো দায়ীদের জন্য সর্বোত্তম পাথেয় যা তাদেরকে দাওয়াতের পথে অবিচল রাখবে এবং দাওয়াতের কষ্টক্লেশ ও প্রতিবন্ধকতা পাড়ি দিতে তাদের সহায়ক হবে। -মিল্লাতু ইবরাহীম, পৃ: ১৫

মুহাম্মদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ (মৃ: হি.) ও مفاهيم ينبغي أن تصحح কিতাবে দ্বীন কায়েমের পথে পাথেয় হিসেবে ইবাদতের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জনের আলোচনা করেছেন। (পৃ: ২১৪-২১৫) তাই আমাদের জন্য ইবাদতের মৌসুম এই রমযানে বেশি বেশি ইবাদত করে জিহাদের জন্য ইমানী প্রস্তুতি গ্রহণ করা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩২৪১

কোরআনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য

ibn masud

Junior Member

০২-০৭-২০১৯

আল কোরআন মানবজাতির জীবনবিধান সম্বলিত এক মহাগ্রন্থ। যাতে সংশয়-সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যা সকল প্রশংসার অধিকারী, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রজ্ঞাময় আল্লাহর পক্ষ হতে সমস্ত মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে অবতির্ণ। যে কিতাবের জ্যোতিময়ী পথনির্দেশনা, কল্যাণধর্মী ফায়সালা, সত্যসন্ধানী প্রচারণা মানবজাতির সামনে দ্বিপ্রহরের সূর্য়ের ন্যায় উজ্জ্বল। সত্যসন্ধানী বিবেকের জন্যে যা সুস্পষ্ট পথ-নির্দেশক আর মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণকারীদের জন্যে এ কিতাব বিপথগামী। কোরআনের ভাষায়:

يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

এ কোরআনের মাধ্যমে অনেকেই পথভ্রষ্ট হবে আর এ কোরআনের মাধ্যমে অনেকেই সুপথ পাবে। পাপাচারী ছাড়া অন্য কেউ এ কোরআনের মাধ্যমে পথভ্রষ্ট হবে না। (সূরা বাকারা: ২৬)

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ

যে ধ্বংস হয় সে দলিলের আলোকেই ধ্বংস হয়। আর যে বেঁচে থাকে সে দলিলের উপরই বেঁচে থাকে। নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ ও সর্বশ্রোতা। (সূরা আনফাল: ৪২)

কোরআনের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে এটিও একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, কোরআন আল্লাহর সাথে সততার পরিচয় দানকারী, সত্যের অনুসারীদেরকে যেভাবে হিদায়াতের পথে পরিচালিত করে। ঠিক তদ্রুপ বিপরীত দিক হতে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণকারীদেরকে বিভিন্ন ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে দেয়। যদ্দরূণ এক সময় তারা হিদায়েতের পথ হতে ছিটকে গিয়ে শয়তানের পাতানো ফাঁদে আটকা পড়ে। শয়তানের কূট-কৌশল আর ধোকায় ধরাশয়ী হয়ে যায়। আর তখন

শয়তান তাদের নিয়ে খেলা করে। তাদের অশুভ কৃতকর্মকে তাদের দৃষ্টি গোচরে শোভন করে দেয়।

এখন আমরা কোরআনের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের একটি যৌক্তিক দৃষ্টান্ত পেশ করবো। আর তখন সত্যবাদীদের জন্যে কোরআন কেন হিদায়াতের আলোক মশাল আর মিথ্যাবাদীদের জন্যে কেন তা বিপথগামীতার মাধ্যম এর কারণ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে। ইনশাল্লাহ।

আমরা জানি একজন ডাক্তারের দায়িত্ব হলো রোগীর আরোগ্যতার লক্ষ্যে সঠিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা। রোগীর রোগ বুঝে সঠিক পথ্য-ফেকসিফশন লিখে দেয়া। এখন ধরে নিন যে, একজন ডাক্তার রোগীর সঠিক চিকিৎসা সেবাই প্রদান করল। রোগীর জন্যে যথাপোযুক্ত ঔষধ সামগ্রী লিখে দিল। সুতরাং এখানে ডাক্তারের প্রদানকৃত ফেকসিফশন ও ঔষধ সামগ্রী রোগীর জন্যে সঠিক পথ-নির্দেশক। এই তো? তাহলে এখন রোগীর জন্যে প্রধান ও প্রথমত করণীয় হলো ডাক্তারের পদত্ত নির্দেশনার ওপর আস্তা ও বিশ্বাস রাখা। দ্বিতীয়ত করণীয় হলো ডাক্তারের লিখিত দিক-নির্দেশনা অনুযায়ি ঔষধ সেবন করা। যা কিনা বাস্তবতার বিচারে রোগীর আরোগ্যতার জন্যে হেদায়েতেরই আলোক মশাল।

কিন্তু রোগী যদি মনে করেন, ডাক্তার সাহেব আমার আরোগ্যতার জন্যেই যেহেতু ঔষধগুলো আমাকে সেবন করতে দিয়েছেন সুতরাং দ্রুত সুস্থতার জন্যে আজই সব ঔষধগুলো খেয়ে নেই? কিংবা সেবন করলেই যেহেতু হয় তাই ফেকশিফশন রোল মানার কিসের প্রয়োজন? যখন যে ঔষধ খেতে ইচ্ছে হয় তখন সেটিই সেবন করব। কিংবা তিক্ত ঔষধ সেবন যেহেতু বিরক্তি কর, তাই মিষ্টি ঔষধটিই শুধু সেবন করি? যাক রোগী যদি কোনো কারণে তখন প্রবঞ্চণার শিকার হয় তবে বাস্তবতার বিচারে ডাক্তারের ফেকসিফশন আর তার জন্যে পথ-নির্দেশনা বা হেদায়েতের ভূমিকা পালন করবে না। ডাক্তারের ফেকসিপশন তার কোনো উপকারেই আসবে না। উল্টো তখন সে বিপথে পা বাড়াবে।

ঠিক তদ্রুপ কোরআনুল কারীমও মানবজাতির জন্যে যেহেতু আল্লাহ পদত্ত এক ঐশী ফেকসিফশন। তাই মুসলিমজাতির জন্যে করণীয় ছিল একজন পাজ্ঞ-বিজ্ঞ ডাক্তারের *ফ্রেকসিফশনকে যতটুক না গুরুত্ব দেওয়া, তার চেয়ে বহুগুন বেশি মানবজাতির জীবন সমস্যার ফেকসিফশন আল কোরআনকে মূল্যায়ন করা। এ

কোরআনকে হাতে নিয়ে চুমু খাওয়া। এ কোরআনের বাস্তবধর্মী দিকনির্দেশনা দ্বারা নিজেদের জীবনকে পুরোই রাঙিয়ে ফেলা। এ দুনিয়ার প্রতিটি বনী আদমকে কোরআনের সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট করা। এ কোরআনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে উজাড় করা দেওয়া। এ কোরআনের বিধান দ্বারাই নিজেদের জীবনের মামলা-মুকাদ্দামা নিষ্পত্তি করা।

কিন্তু মুসলিমজাতি আজ তাদের দায়-দায়িত্বের কথা পুরোই ভুলে গিয়েছে। তারা আল্লাহর সম্মান, আল্লাহর কিতাবের সম্মান আস্তাখোড়ে নিক্ষেপ করেছে। দুনিয়ার মোহ-মায়ার প্রতি মুসলিমজাতি আজ এমনই লালায়িত যে, এদেরকে দেখলে মনেই হবে না এরা ঐশী গ্রন্থ আল কোরআনের ধারক-বাহক। এ দুনিয়ায় আল্লাহর মনোনিত প্রতিনিধি। কুকুর যেমন সামান্য হাড্ডি-ঝোটুর জন্যে লালায়িত হয়ে হাড্ডি-ঝোটুর প্রতি এক ধরনের অভিনব দৃষ্টিতে থাকিয়ে থাকে ঠিক তদ্রুপ মুসলিমজাতিটিও আজ দুনিয়ার কিঞ্চিৎ আরাম-আয়েশ কৃত্রিম বিত্ত-ভৈববের প্রতি এমন লালায়িত যে, শিগাল-কুকুরের সব ধরনের আচার-আচরণই তাদের থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। চলমান দুনিয়ায় এ জাতিটিকে কোনো যুক্তির আলোকেই আদর্শিক জাতি বলা যাবে না।

স্বর্ণ যত দামি আর মূল্যবান পদার্থই হোক না কেন? যতক্ষণ এ প্রদার্থটিকে ভেজাল মুক্ত করা না হবে। স্বর্ণের সরলতার সুযোগে এ পদার্থটির অস্তিতের সাথে জড়িয়ে পড়া খাত যতদিন না বিদূরিত করা হবে, ততদিন শুধু নাম আর জষেই প্রদার্থটির পরিচয় পর্ব বাকি থাকবে। কিন্তু বাস্তব কার্যকারিতার ক্ষেত্রে খাত যুক্ত এ স্বর্ণের কোনো মূল্য নেই। ঠিক তদ্রুপ মুসলিমজাতি সত্তার পরিচয়টি সাধারণ কোনো পরিচয় নয়। বরং তা স্বর্ণের চেয়ে আরো বহুগুন দামি একটি পরিচয়। মুসলিম জাতিসত্তা নামক পদার্থটি সাধারণ কোনো পদার্থ নয়। বরং তা হিরে, মানিক, মক্তার চেয়ে আরো দামি কোনো পদার্থ। কিন্তু হবে কি? স্বর্ণের চেয়েও দামি জাতিটি যে আজ সে উক্তিরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি "সর্বাঙ্গেই ব্যথা ঔষধ দিব কোন যায়গা"। হিরে মানিক মুক্তার চেয়ে দাবি এ পদার্থেয় আজ সব অপদার্থের যায়গা।

অথচ মুসলিম জাতিসত্তার পরিচয় ধারণ করা কোনো কথার কথা নয়। মুসলিম জাতিসত্তার সাথে নিজ সম্পর্কের দাবি তুলা কোনো চাট্টিখানি বিষয় নয়। আমাদের জাতিরপিতা হযরত ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো আমাদেরকে আনুষ্ঠানিক

মুসলিম হওয়ার জন্যে, মুসলিম জাতিসত্তার পরিচয়টি দিয়ে যাননি? আল্লাহ তো আমাদেরকে চুল-দাড়ি কেটে, গোপ্তাঙ্গের খৎনাকাজ সেরেই কেবল মুসলিম হতে বলেননি? সুতরাং আমাদেরকে জাতীয় পরিচয় পত্রের বিচারে মুসলিম হলে চলবে না। আমাদেরকে মিল্লাতে ইব্রহিমের অনুসারি মুসলিম হতে হবে। তাওহীদবাদি মুসলিম হতে হবে। যাক, আল্লাহ আমাদের সকলকে প্রকৃত মুসলিম হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন!

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৩২৯

তাদাব্বুরে কুরআন!

Talhah Bin Ubaidullah

Senior Member

০৬-০৩-২০১৯

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

তাদাব্বুরে কুরআন!

(১). তাদাব্বুর (تَدَبُّر) অর্থ গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা। অনুধ্যান করা। সাধারণত কুরআন কারীমের আয়াত নিয়ে চিন্তাভাবনাকে তাদাব্বুর বলে।

(২). দাল-বা-রা (دبر) এই তিন হরফ যোগে গঠিত শব্দ কুরআন কারীমে সাত ধরনের শব্দে সর্বমোট ৪৪ বার এসেছে।এই শব্দমূলের মূল অর্থ: পেছন দিক। পরে আসা।

(৩). একটা কথা শুরুতেই বলে রাখি, কুরআন কারীম অর্থ না বুঝেও পড়াও একটা ইবাদত। প্রতি হরফে দশ নেকি।

(৪). কুরআন কারীম নাযিল করা হয়েছে, হেদায়াতের জন্যে। না বুঝলে কিভাবে হেদায়াত আসবে? সবাইকেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে কুরআন বোঝার মেহনত শুরু করা জরুরী।

(৫). কুরআন বোঝার মেহনত শুরু করার আগে কিছু ধাপ আছে। সেগুলো অতিক্রম না করে, কুরআন বুঝতে যাওয়া নিরাপদ নয়। ফলপ্রসূও নয়।

(৬). এই কুরআন ছোট্ট শিশু পড়ে, অবুঝ বালক পড়ে। কিছু না বুঝেই তারা পড়ে। তাবীল-তাদাব্বুর সম্পর্কে তাদের কোনও ধারনাই নেই। কিন্তু বড় হওয়ার পরও এভাবে না বুঝে পড়তে থাকা যুক্তিসঙ্গত নয়। ধর্মসঙ্গতও নয়। একটু একটু করে হলেও বোঝার মেহনত শুরু করা উচিত।

(৭). কুরআনের তাদাব্বুর সমস্ত শরীয়তের যাবতীয় ইলমের চাবিকাঠি। তাদাব্বুরের মাধ্যমে কুরআন থেকে কল্যাণকর দিক-নির্দেশনা লাভ করা যায়। ঈমান বৃদ্ধি পায়।

(৮). মানুষ ডাক্তারিবিদ্যার বই পড়ে, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের বই পড়ে, অন্য আরো বিদ্যার বই পড়ে। বোঝার জন্যেই পড়ে। পঠিত বইয়ের তথ্যজ্ঞান নিজের মধ্যে ধারণ করার জন্যে পড়ে। তাহলে কুরআনকে কেন না বুঝে পড়া হবে? কুরআন থেকেই তো সত্য ও মিথ্যার জ্ঞান আহরণ করা হয়। ভাল ও মন্দের জ্ঞান লাভ হয়! ধর্ম অধর্ম চেনার উপায় জানা হয়।

= কথা আছে, অন্য বই অর্থ বোঝা ছাড়া পড়ে কোনও লাভ নেই কিন্তু কুরআন অর্থ বোঝা ছাড়া পড়লেও সওয়াব মেলে। তাই বলে শুধু পড়ার সওয়াব নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা, কুরআনের হক আদায়ে যথেষ্ট নয়।

(৯). একটা পাহাড়ের কথা কল্পনা করি! যদি কুরআন তার উপর নাযিল হতো, সেটা ভয়ে ভারে চুরমার হয়ে যেতো। পাহাড়ের তুলনায় মানুষের হৃদয় ছোট্ট একটা দানার মতো। কতো কতো কুরআন পাঠ শোনে, তবুও কেন বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়ে না? কারণ একটাই , তাদাব্বুর করে না।

(১০). ধীরে ধীরে কুরআন পাঠই তাদাব্বুরের জন্যে সহায়ক। নবীজি সা. কিভাবে তিলাওয়াত করতে সেটা উম্মে সালামা রা. দেখিয়েছিলেন। সেটা ছিল ধীরে ধীরে তিলাওয়াত। প্রতিটি হরফকে আলাদা আলাদা করে স্পষ্ট তিলাওয়াত।

-আনাস রা. বলেছেন: নবীজির তিলাওয়াত ছিল ধীরগতির। টেনে টেনে। থেমে থেমে।
-ইবনে আবি মুলাইকা রহ. বলেছেন; আমি একবার ইবনে আব্বাস রা.-এর সাথে সফরে গিয়েছি। তিনি অর্ধেক রাত নামাজ পড়তেন। নামাযে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, প্রতিটি হরফকে আলাদা করে উচ্চারণ করে। পড়তে পড়তে কাঁদতেন। দূর থেকেও তার ফোঁপানোর আওয়াজ ভেসে আসতো।

(১১). তাদাব্বুর করে করে কুরআন পড়ো। তাহলে অর্থ বুঝতে পারবে। কুরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাদাব্বুর করো। আমলের নিয়তে পড়ো।

অমনোযোগী হয়ে পড়ো না। পরিপূর্ণ সচেতনতার সাথে পড়ো। কোনও আয়াতে সন্দেহ লাগলে আলিমের কাছে প্রশ্ন করে জেনে নাও।

-ইবনে বায রহ.।

(১২). আজ কুরআনবিমুখ মানুষের ছড়াছড়ি। কুরআন মেনে চলা মানুষ আজ চারদিকে লাঞ্ছিত। কুরআনের দিকে আহবানকারী আজ উপেক্ষিত। এটা দেখে তুমি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেও না। প্রকৃত জ্ঞানী সাহসী ব্যক্তি সমালোচকদের ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় না।

-শায়খ শানকীতি রহ.।

(১৩). কুরআন পাঠকারীর মূল ভূষণ হবে বিনয়। ন□্রতা। এর দ্বারা তার চিত্ত উন্মুক্ত হবে। হৃদয় আলোকিত হবে। সালাফ একটা আয়াত নিয়েই পুরো রাত কাটিয়ে দিয়েছেন। তাদের কত রাত কেটে গেছে কুরআনের তাদাব্বুরে!
-ইমাম নববী রহ.।

(১৪). একজন বুদ্ধিমান মুমিনের জন্যে কুরআন হবে আয়নার মতো। আয়নায় চেহারা দেখা যায়। সুন্দর অসুন্দর ফুটে ওঠে। কুরআন পাঠের সময়ও নিজের ভাল দিক মন্দ দিক স্পষ্ট হয়। কোনও আয়াতে ভাল একটা গুণের কথা আলোচিত হলে, আমার মধ্যে গুণটা আছে কি না, সেটা ধরা পড়ে। একজন মুমিন তিলাওয়াত করার সময়, ভয়ের আয়াত এলে ভয় পায়। আশার আয়াত এলে আশান্বিত হয়। কুরআনকে এভাবে পাঠ করলে, কুরআন হবে তার জন্যে সুপারিশকারী। সাক্ষী। বন্ধু। রক্ষাকবচ। আর সে নিজেও হয়ে উঠবে সবার জন্যে উপকারী বন্ধু। দুনিয়া ও আখেরাতে তার পিতামাতার উপর, তার সন্তানদের উপর নেমে আসবে কল্যাণ।
- ইমাম আ-জুররী রহ.।

(১৫). দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা। কার জন্যে? আল্লাহর জন্যে। রাসূলের জন্যে। কুরআনের জন্যে। মুসলিম ভাইয়ের জন্যে। কুরআনের জন্যে কল্যাণকামিতা হলো:
-কুরআনের প্রতি তীব্র ভালবাসা থাকা। কুরআনের প্রতি অত্যন্ত সশ্রদ্ধ থাকা। কুরআন বোঝার প্রতি তীব্র আগ্রহ থাকা। কুরআন তাদাব্বুরের প্রতি গভীর মনোযোগ থাকা। কেন? আল্লাহ কী বলেছেন সেটা জানার জন্যে।

(১৬). একজন সাধারণ নসীহতকারীর কথা মানুষ বোঝে। তার পক্ষ থেকে কোনও চিঠি এলে তার মূলবার্তা উদ্ধার করতে পারে। বার্তা অনুযায়ী জীবন গড়ে। কুরআন কারীমের কল্যাণকামীও গুরুত্বের সাথে এর বাণী বোঝার চেষ্টা করে। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা বাণীকে আমরা না বুঝে থাকি! এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ?

.

(১৭). এক আরব অধ্যাপক বললেন:

-আমার আব্বু ছিলেন হাসপাতালে। বয়সজনিত নানা রোগ উপসর্গ দেখা দিয়েছে। শরীরে বাসা বেঁধেছে নানা-অসুখবিসুখ। কথা বলতে পারেন না। ডাক্তার বেশি বেশি ঘুমুতে বলেছেন। কিন্তু আমি যখনই তাকে দেখতে যেতাম, তার হাতে কুরআন দেখতাম!

-ডাক্তার আপনাকে বেশি বেশি ঘুমুতে বলেছেন!

-বাছা, কুরআন পড়ার আনন্দে ঘুম আসে না!

-কয়পারা পড়তে পারেন! সারা দিনে বেশি পড়া যায় না, সাত পারা পর্যন্ত হয়! আমি জানি, আব্বু প্রতিটি আয়াতকে কয়েকবার করে পড়েন। নিজেকে প্রশ্ন করেন। অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবেন!

(১৮). প্রিয়তমকে যতটুকু ভালবাসি, তার কথাও সে পরিমাণে প্রিয় হয়। আল্লাহকে যতটা ভালবাসি তার কালামও সে পরিমাণে প্রিয় হবে আমার কাছে। কুরআন নিয়ে মেহনতের পরিমাণই বলে দিবে আমি আল্লাহকে কতোটা ভালবাসি!

(১৯). কুরআন নিয়ে থাকা মানে আল্লাহর সাথে ব্যবসায় নামা। আল্লাহ তা'আলা এ-ব্যাবসায় কতো হারে লাভ দেবেন, সেটা বান্দা কল্পনাও করতে পারবে না। এই ব্যবসার ট্রেড লাইসেন্স শুধু দুনিয়াতেই নয়, আখেরাতেও এর মেয়াদকাল ব্যাপ্ত থাকবে। লাভ আসতে থাকবে দুনিয়া ছাড়িয়ে আখেরাতেও।

(২০). কুরআনের সুর কী চমৎকার! কী মোহনীয়! কী কমনীয়! পাথরহৃদয়কেও নরম করে দেয়। কোমল করে দেয়। ভিজিয়ে দেয়। কুরআনের সামনে কোনও অহংকারী দাম্ভিক টিকতে পারে না। কাফের মুনাফিক নাস্তিকও দাঁড়াতে পারে না। কুরআন হলো জীবন-নদী। প্রাণদায়িনী বারিধারা। উচ্ছল ঝরনা। আল্লাহর কাছ

থেকে বয়ে এসে বান্দার হৃদয়সাগরে এসে মিলিত হয়। বান্দার হৃদয় হলো কুরআনের মিলন মোহনা। হৃদয়কে মুমিন বানায়। আল্লাহভীরু বানায়। হৃদয়কে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে। সব ধরনের কল্যাণ দিয়ে টইটম্বুর করে দেয়। এজন্য চাই কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর!

(২১). পথ চলতে চলতে দ্বিধা তৈরি হলে, জীবনে সংকট দেখা দিলে, সাথে সাথে কুরআনের কাছে ফিরব। আল্লাহ কী বলেছেন, বোঝার চেষ্টা করবো। দূর হয়ে যাবে হয়রানি। দুশ্চিন্তা। মানুষ কষ্টের সময় আপনজনের কাছেই ফিরে আসে। আমাদের আপনজন আল্লাহ। তার কালাম হবে মাধ্যম।

(২২). কুরআন কারীমের স্বাদ পেতে হলে, জীবনটা গুনাহমুক্ত হতে হবে। গুনাহ হলো জংয়ের মতো। কলব আয়নার মতো। গুনাহর প্রভাবে কলবে কালিমা পড়ে যায়। কুরআন জংধরা কলবে প্রতিফলিত হয় না।

(২৩). তিলাওয়াতের সময় কাঁদা মুস্তাহাব। কান্না না এলে কান্নার ভান করা। অতীতের দুঃখ-শোকের কথা চিন্তা করে কান্না আনার চেষ্টা করা। যদি শোক-দুঃখের কথা কল্পনা করার পরও মনে দুঃখবোধও না আসে, তাহলে এই না আসার জন্যেই আগে কাঁদা দরকার! কারণ এটা আরও বড় বিপদ! পাথরহৃদয় মানুষের নিন্দা করা হয়েছে কুরআনে। হাদীসে।

(২৪). নফল ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা তার রবের বেশি নৈকট্য অর্জন করতে পারে। কুরআন তিলাওয়াত শ্রেষ্ঠতম নফল। কুরআন শোনা, তাদাব্বুর করাও এর অন্তর্ভুক্ত। খাব্বাব রা. একলোককে বলেছিলেন:

-যতটুকু সাধ্যে কুলোয় আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করো। আর আল্লাহর কালামই নৈকট্য লাভের কার্যকর মাধ্যম।

(২৫). মুসলিম উম্মাহর যখনি দুর্দিন আসবে, তার উচিত কুরআনের সাথে তার সম্পর্কটা কেমন প্রথমে যাচাই করে নেয়া। সাধারণত উম্মাহর সমস্যা আসা শুরু হয় কুরআনের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ার মধ্য দিয়ে। আর কুরআনের তাদাব্বুর কমে গেলেই উম্মাহর উপর বিপদের ঘোর অমানিশা নেমে আসে। তখনো কিন্তু তিলাওয়াত ঠিকই চলতে থাকে। থাকে না শুধু 'তাদাব্বুর'।

(২৬) নাগরিক জীবনে যত সমস্যা দেখা দেয়, এর অন্যতম কারণ হলো, কুরআন থেকে দূরে সরে যাওয়া। নিয়মিত কুরআনের সাথে লেগে থাকলে, যাবতীয় সন্দেহ দ্বিধা কাছেই ঘেঁষতে পারবে না। এমনিতেই সুখ নেমে আসবে।

(২৭). ইউসুফ বিন আসবাত রহ.-কে প্রশ্ন করা হল:

-কুরআন খতমের পর কী দু'আ করেন?

-আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। কারণ, খতম করার পর, ভাবতে বসি পুরো কুরআনের কোনও কোনও হুকুম আমি মান্য করেছি, কোনও কোনও হুকুম মান্য করতে পারিনি! হিশেব করলে দেখা যায়, অনেক হুকুম আমি মান্য করছি না! এজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া চাড়া আর কোনও উপায় দেখি না! কারণ না মানার পরিমাণই যে বেশি!

(২৮). হেদায়াত চাইলে তাদাব্বুর করতেই হবে। কারণ ইলম ও হিদায়াত হলো তাদাব্বুরেরর অধীনস্থ বিষয়।

(২৯). পথহারা কেউ যদি পথ পাওয়ার উদ্দেশ্যে কুরআন নিয়ে বসে। তাদাব্বুরের মাধ্যমে পথের সন্ধান করে, তাহলে তার সামনে পথ খুলে যায়।

(৩০). বান্দার হেদায়াতের সাথে সম্পৃক্ত এমন প্রতিটি আয়াতের ব্যাখ্যাই কুরআনে দেয়া আছে। আমি বুঝতে না পারলে, ধরে নিতে হবে, আমার কোথাও অসম্পূর্ণতা আছে।

(৩১). মুসলিম বিশ্বে এমনকি অমুসলিম দেশে হাজার-হাজার মাদরাসা আছে। যেখানে কুরআন হেফয করানো হয। কিন্তু শুধু কুরআনের তাদাব্বুর নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে কাজ করবে, এমন মাদরাসা বিরল।

(৩২). একজন মুসলমানকে যদি প্রশ্ন করা হয়:

-আপনি কি বিশ্বাস করেন, কুরআন কারীম হলো বান্দার জন্যে হেদায়াত, নূর ও শিফা?

-অবশ্যই বিশ্বাস করি!

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, বেশির ভাগ মুসলমান শুধু রমযান এলেই কুরআনের কথা স্মরণ করে। অনেকেই তো তাও করে না। যেন বাকী এগার মাস হেদায়াত নূর ও শিফার প্রয়োজন নেই।

(৩৩). পাপী হৃদয়ের জন্যে, কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণের চেয়ে বড় ওষুধ আর কিছু হতে পারে না।

(৩৪). হৃদয়কে নাড়া দেয় এমন করে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। সূরা বা পারা শেষ করা যেন কোনওভাবেই উদ্দেশ্য না হয়। এজন্য কুরআনের রুটিনটা পারাভিত্তিক নয়, সময় ভিত্তিক হলে ভাল। আমি প্রতিদিন এতক্ষণ সময় কুরআন নিয়ে ফিকির করবো।

(৩৫). জাহেলের কথার চেয়ে আলেমের কথা শোনা ভাল। অন্যের কথা শোনার চেয়ে ¯স্নেহময় পিতার কথা শোনা ভাল। আল্লাহ হলেন সবচেয়ে বড় আলিম, সবেচেয়ে বেশি ¯স্নেহশীল। তার কথাও সবার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাওয়ার কথা। তাদাব্বুরের সাথে, ভালবাসার সাথে।

(৩৬). মনোযোগের সাথে আল্লাহর কালাম, নবীজির কালাম শুনলে এবং তাদাব্বুর করলে, না বুঝে পারার কথা নয়। প্রথম দিনেই সব হয়ে এমন ভাবলে তো চলবে না! নিয়তান্ত্রিকভাবে এগুতে হবে।

(৩৭). কুরআন তাদাব্বুরের বড় এক বাধা হলো 'গান'। সংগীত কলবকে হেদায়াতবিমুখ করে দেয়। কুরআনবিমুখ করে দেয়। কুরআন ও গান এক পাত্রে জমা হতে পারে না। গান মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে 'প্রবৃত্তির' পূজার। কুরআন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে প্রবৃত্তির বিরোধিতার। কুরআন মানুষের মনে শুভবোধ তৈরী করে, গান তৈরী করে অশুভবোধ। কুরআন ডাকে হকের দিকে গান ডাকে বাতিলের দিকে। কুরআন ডাকে সত্যের দিকে গান ডাকে মিথ্যার দিকে। কুরআন ডাকে আল্লাহর দিকে, গান ডাকে তাগুতের দিকে।

(৩৮). ১৮৫ জন বন্দীর মধ্যে একটা জরিপ চালানো হয়েছিল। তাদেরকে শর্ত দেয়া হয়েছিল, কুরআন হেফয করতে পারলে মুক্তি দেয়া হবে। সাধারণভাবে সাজা ভোগ করে যেসব অপরাধী মুক্তি পেয়েছিল, তাদের অনেকেই পুরনায় কারাগারে

এসেছে। আবার কোনও অপরাধ করে। কিন্তু হিফযের শর্ত পূরণ করে মুক্তি পাওয়া ব্যক্তিদের পুনরায় অপরাধ করে জেলে আসার হার ছিল শতকরা ০%।

(৩৯). কোনও আয়াত নিয়ে তদাব্বুর করতে বসলে, শুধু এই আয়াতেই দৃষ্টিটা সীমাবদ্ধ না রেখে, আগের পরের আয়াতের দিকেও গভীর মনোযোগের সাথে খেয়াল রাখা উচিত! তাতে কাঙ্খিত আয়াত বুঝতে সহজ হবে।

(৪০). কুরআন কারীম শুধু মুখস্থ তিলাওয়াত করলে সওয়াব আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, শুধু তিলাওয়াতের জন্যে কুরআন নাযিল হয়নি।

(৪১). কুরআন পাঠের সময় তাজভীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। কিন্তু তাজভীদ নিয়ে অতি ব্যস্ততা পাঠকারীকে আয়াতের অর্থ বুঝতে বাধা দেয়।

(৪২). আমি শায়খ শানকীতি রহ.-কে দেখেছি, তিনি প্রতি রাতে -শীত হোক গ্রীষ্ম হোক- নির্দিষ্ট পরিমাণে তিলাওয়াত করতেন। তাহাজ্জুদে। তিনি বলতেন: রাতের নামাযে পড়া ছাড়া, কুরআন বোঝা যায় না। বুঝলেও সে বুঝ স্থায়ী হয় না। শায়খ আতিয়া সালেম রহ.।

(৪৩). যে শিশু বা কিশোর বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই কুরআন কারীম হিফয করে ফেলে, তাকে বাল্যকালেই আল্লাহর পক্ষ থেকে হেকমত দিয়ে দেয়া হলো -ইবনে আব্বাস!

এই শিশুটার মধ্যে একজন নবীর গুণাবলী চলে আসে। ঈসা আ.-কেও শৈশবে হিকমত প্রদান করা হয়েছিল। একজন শিশু যদি কুরআন হিফযের কারণে এই মর্যাদা অর্জন করতে পারে, তাহলে যে কুরআনকে তাদাব্বুর করে বোঝার চেষ্টা করে ও কুরআনের বাতলানো পথে চলতে চেষ্টা করে, তার মর্যাদা কেমন হবে? তার মর্যাদা তো আরও বহুগুণে বেশি হওয়ার কথা!

(৪৪). একজন আরবের স্মৃতিচারণ:

-আমি ট্রেনে করে যাচ্ছিলাম। পাশেই বসেছিলেন একজন তুর্কি ভদ্রলোক। দীর্ঘ পথযাত্রা। তিনি ব্যাগ থেকে কুরআন বের করে পড়তে শুরু করলেন। একটু পর কাদতে শুরু করলেন। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম!

-কেন কাঁদছেন? আপনি কুরআন কারীম বোঝেন?

-জ্বি না, বুঝি না, তবুও কুরআন না বুঝে পড়লেও, মনে হয় কী যেন বুঝছি! কী যেন বুঝে যাচ্ছি! আফসোস হয়, আহা! যদি আরবীটা বুঝতে পারতাম! আচ্ছা আপনারা তো আরব, আমার সাথে কয়েকজন আরব থাকেন, তাদেরকেও কুরআন তিলাওয়াত করতে দেখি, কিন্তু তারা কুরআন বোঝেন, তবুও তারা কাঁদেন না কেন?

(৪৫). তোমরা আমাকে এসব ছাঁইপাশ বিদাতি কথাবার্তাপূর্ণ কিতাবপত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ! আমি বলছি শোন, এসব বই বর্জন করো! তোমরা সালাফের কিতাবাদি পড়! কুরআন পড়ো! আল্লাহর কিতাবে যদি তোমাদের উপদেশের জন্যে যথেষ্ট না হয়, তাহলে, এসব কিতাবে তোমাদের জন্যে গোমরাহী ছাড়া আর কিছু নেই

-আবু যুরআ রাযী রহ.।

(৪৬). কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা বারবার তাকিদ দিয়েছেন, তার কালাম দিয়েই যেন মানুষকে দাওয়াত দেয়া হয়।

—— **(وأَنْ أَتْلُوَا)** এবং আমি যেন কুরআন তিলাওয়াত করি। নামল: ৯২।

—— নবীজিকে আদেশ করা হয়েছে, তিনি যেন মানুষকে তিলাওয়াত করে শোনান। দাওয়াত দেন।

—— **(حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ)** সে (বন্দী কাফের) আল্লাহর বাণী শোনা পর্যন্ত (আশ্রয় দেবে)। তাওবা ৬।

কাফির বন্দী হলে, তাকেও কুরআন কারীম শোনানোর ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। যাতে তার ঈমান আনার একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়।

—— **(اتْلُ ما أُوْحِيَ إِلَيْك من الكِتابِ)** (হে নবী!) ওহীর মাধ্যমে আপনার প্রতি যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তা তিলাওয়াত করুন (আনকাবূত: ৪৫)।

= এসব আয়াত পড়লে বোঝা যায়, কুরআন কারীমের মাধ্যমে দাওয়াত দিলে বেশি ফলপ্রসূ হয়। এবং নিছক পাঠ নয়, বুঝে বুঝে পাঠের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(৪৭). এক যুবককে চিনি। বড় ঘরের সন্তান। ধন-সম্পদে ভরপুর। প্রাণ ও প্রাচুর্য যেন উপচে পড়ছে। পরিবারের সবাই জাগতিকভাবে উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু সে উজ্জল ব্যতিক্রম। কুরআনে হাফেয। ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত। পরিবারের ভোগ-বিলাসী যিন্দেগীর কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারে নি! বেশির ভাগ সময় কুরআন পড়ে। কুরআনের কথা বলে। কুরআনের দিকে দাওয়াত দেয়। যেহেতু আর্থিক চিন্তা নেই, পুরো সময়টা সে এ-কাজেই ব্যয় করতে পারে। আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম:

-তুমি কিভাবে এ-পথে পা বাড়াতে পারলে? পরিবারের প্রথায় আরামের জীবন ছেড়ে?

-কিভাবে এসেছি ঠিক বলতে পারবো না! তবে আমার কাছে কিভাবে যেন কুরআনকে ভাল লেগে গিয়েছিল। আব্বু আমার জন্যে বিদেশ থেকে সুন্দর একটা কুরআন শরীফ এনেছিলেন। ওটা ছিল কারুকার্যখচিত। আব্বু ধার্মিক নন। কিন্তু তার কী মনে হয়েছিল, আল্লাহই ভালো বলতে পারবেন! সবার জন্যে দামী খেলনা এনেছেন। ব্যতিক্রমভাবে শুধু আমার জন্যেই কেন কুরআনখানা আনলেন! কুরআন শরীফ যখন কিনতে গেলেন, পাশে আরেকজন ক্রেতা ছিলেন। আব্বু দোকান থেকে বের হওয়ার উপক্রম হতেই পাশের ভদ্রলোক আব্বুকে প্রশ্ন করলেন:

-কার জন্যে কিনলেন?

-আমার ছোট্ট ছেলের জন্যে! কিনতে এসেছিলাম খেলনা! কিন্তু এত সুন্দর কুরআন শরীফ দেখে রেখে যেতে মন চাইল না!

-বেশ করেছেন! আপনার ছেলেকে বলবেন:

-তোমার অদেখা চাচ্চু বলেছেন, কুরআন কারীম বাইরে দেখতেই শুধু সুন্দর নয়, এর অর্থ আরও অনেক বেশি সুন্দর!

ব্যস! আব্বু ফিরে এসে হুবহু সেই চাচ্চুর কথা আমাকে বলেছেন। আমি আব্বুর কথা শোনার সাথে সাথে বললাম:

-আব্বু! আমি কুরআনের অর্থ শিখব!

আব্বু ভীষণ অবাক হলেন।সাথে সাথে বললেন: ঠিক আছে। তোমার দাদুর সাথে কথা বলে নিই!

এরপর আর কী, কুরআন কারীম নিয়েই আছি।

(শায়খ আবদুর রহমান আকল)।

(৪৮). বান্দা যখন খালেস নিয়তে আল্লাহর কালাম শোনে, আল্লাহ তাকে কালাম বোঝার তাওফীক দিয়ে দেন। তার কলবকে নূর দ্বারা পূর্ণ করে দেন (ইমাম কুরতুবী)।
(৪৯). কুরাআন আমার পক্ষের স্বাক্ষী হবে অথবা আমার বিপক্ষের স্বাক্ষী হবে (মুসলিম)।

القرآن حُجَّةٌ لَكَ أَو عَلَيْك

যাকে কুরআনের ইলম দান করা হয়েছে, কিন্তু সে এর দ্বারা উপকৃত হলো না, যে কুরআনের নিষেধসমূহ জানার পরও বিরত হল না, কুরআন তার বিরুদ্ধে স্বাক্ষী হবে (কুরতুবী)।

(৫০). অনেকে হৃদয়ের প্রশান্তির জন্যে, চিত্তশুদ্ধির জন্যে কসীদা শোনে, গান শোনে, সামা শোনে! এ-ধরনের লোকদের কুরআনের প্রতি আগ্রহ দিনদিন কমে যায়! এক সময় কুরআনের প্রতি ঘৃণাই জন্মে যায়। মনের শান্তির জন্যে বেশি বেশি গযল শোনাও ক্ষতিকর। কুরআনের প্রতি উদাসীনতা চলে আসে।

(৫১). ঈসা বিন ওয়ারদান রহ.-কে প্রশ্ন করা হল:

-দুনিয়াতে আপনার একমাত্র চাওয়া কী?

প্রশ্নটা শুনেই তিনি কেঁদে দিয়ে বললেন:

-আমার চাওয়া হলো,, আমার বক্ষটা উন্মুক্ত করে দেয়া হবে, যাতে আমি দেখতে পারি, সারাজীবন কুরআন তিলাওয়াতের কী প্রভাব সেখানে পড়েছে! আমাদের সালাফগণ কুরআন কারীম নিয়ে এমনই বুঁদ ছিলেন।

(৫২). হাদীসে আছে, কুরআন শিক্ষাকারী ও শিক্ষাদানকারী ব্যক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ। এখানে শিক্ষা বলতে শুধু শব্দশিক্ষা নয়, বরং অর্থও উদ্দেশ্য। কারণ অর্থ শিক্ষার ফলেই ঈমানের বৃদ্ধি হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. বলেছেন:

-আমরা আগে ঈমান শিখতাম তারপর কুরআন শিখতাম। ফলে আমাদের ঈমানে বৃদ্ধি ঘটতো। কিন্তু তোমরা এখন উল্টোটা করো। আগে শেখো কুরআন তারপর শেখো ঈমান।

এজন্যই তারা একেকটা সূরা শিখতে দীর্ঘ দীর্ঘ সময় লাগিয়ে দিতেন।

(৫৩). কুরআন কারীমের প্রতিটি সূরা একটার সাথে আরেকটার যোগসূত্র আছে। এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের সংযোগ আছে। সূরার প্রথম আয়াতের সাথে শেষ আয়াতের সংযোগ আছে। একসূরার শেষ আয়াতের সাথে পরের সূরার প্রথম আয়াতের সংযোগ আছে। এগুলো একটু চিন্তা করে করে তিলাওয়াত করলে, তাদাব্বুরটা সহজ হয়।

(৫৪). আল্লামা ইকবাল রহ. শেষ জীবনে তাদাব্বুরে কুরআনের প্রতি মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করে বলতেন:

-কুরআন কারীম নিছক একটা কিতাব নয়, তার চেয়েও বেশি কিছু।

(৫৫). কুরআন কারীমের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখে এমন আলিম বর্তমানেও অনেক আছেন। একজন আলিম, বয়ান করতে গিয়ে, একটা বিষয় প্রমাণ করতে গিয়ে, বিভিন্ন আঙ্গিকে একশটা আয়াত উপস্থাপন করেছেন। শ্রোতাদের মনে হয়েছে, তাই তো, এ-বিষয়ে এতগুলো আয়াত আছে, আমাদের কল্পনাতেই ছিল না!

(৫৬). মানবজীবনের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন, জান্নাতের বিস্তৃতি আসমান-জমীনের সমান। কিন্তু অনেক মানুষ এই জান্নাতে একটা কদম রাখার স্থানও পাবে না।

(৫৭). কুরআন কারীমকে গানের সুরে প্রচার করার জন্যে একদল লোক উঠেপড়ে লেগেছে। এমনকি ইহুদি নাসারাদের পরিচালিত টিভি-রেডিওতেও এর বহুল প্রচার হচ্ছে। কারণ? তারা জানে, এই গীতালি কুরআন মৃতকে জীবিত করা তো দূরের কথা, যারা জীবিত আছে তাদেরকেও মৃত বানিয়ে ছাড়বে!

(৫৮). এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, কুরআন কারীমের ব্যাখ্যায় যত সুন্দর ভাষা, যত আকর্ষণীয় শব্দই ব্যবহার করা হোক, আল্লাহর কালামের সব 'অর্থ' প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। বান্দার এ প্রয়াস হবে সিন্ধু থেকে বিন্দু আহরণের মতো। তাই

একটা আয়াতের বাহ্যিক কিছু দিক বুঝে, সন্তুষ্ট হয়ে ভাবা ঠিক হবে না: এই আয়াতের সব বুঝে ফেলেছি। এই আয়াতে আর বোঝার কিছু বাকী নেই। এটা ভুল চিন্তা। একটা আয়াতের পুরোপুরি অর্থ অনুধাবন করতে পারা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য বাহ্যিক অর্থ বোঝার পরও একটা আয়াত নিয়ে তাদাব্বুর চালিয়ে যেতে হবে।

(৫৯). কুরআন কারীমে ১৩০ বার 'কলব' শব্দটা উল্লেখ হয়েছে। কলবের সাথে ৩৬টারও বেশি 'আমল' ও গুণাবলীকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এতে করে কলবের গুরুত্ব বোঝা যায়। কলবই হলো শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের রাজা। মানুষ এই কলবের প্রতিই সবচেয়ে বেশি উদাসীন থাকে। কলবে পরিশুদ্ধ করার কোনও উদ্যোগ সে গ্রহণ করে না। অথচ শরীরের অন্যান্য অঙ্গ নিয়ে তার ভাবনার শেষ নেই। এই কলবকে ঠিক করার শ্রেষ্ঠ দাওয়াই হলো: কুরআন। তিলাওয়াত ও তাদাব্বুরের মাধ্যমে।

(৬০). কুরআন কারীম নাযিল করার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো:

لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

যাতে মানুষ এর (আয়াতের) মধ্যে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে (সোয়াদ ২৯)।

(৬১). আমার ভীষণ অবাক লাগে, কুরআন তেলাওয়াত করে, অথচ তাদাব্বুর করে না, তাহলে যে কুরআন পাঠ করে কী মজা পায়?

-ইবনে জারীর)।

(৬২). আমাদেরকে কুরআন কারীম দান করার উদ্দেশ্য হলো, আমরা কুরআন কারীম বুঝবো, বুঝ অনুযায়ী আমল করবো। যার এমন হিম্মত নেই সে প্রকৃত দ্বীনদারই নয় (সালাফ)।

(৬৩). কুরআন কারীমের আলোচনা করতে গেলে তিন শ্রেণীর মানুষ বের হয়: ক. কুরআন পাঠকে পরিত্যাগ করেছে। এদের বিরুদ্ধে নবীজি আল্লাহর কাছে অভিযোগ করেছেন।

খ. কুরআন কারীম তিলাওয়াত করেন। তবে তাফসীর জানে না। তাদের জীবনে কুরআন কারীমের কোনও প্রভাবও দেখা যায় না।

গ. কুরআন কারীম বোঝে। তাফসীরও বোঝে। কিন্তু তাদাব্বুর করে না।

(৬৪). যে তাদাব্বুর হৃদয়কে পরিবর্তন করে না, আমল পর্যন্ত নিয়ে যায় না, তা তাদাব্বুর হতে পারে না।

হাসান বসরী রহ. বলেছেন ইলম দুই প্রকার:

ক. কলবে বাস করে এমন ইলম। এটা উপকারী।

গ. যবানে বা জিহ্বায় থাকে এমন ইলম। এটার জন্যে বান্দা আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হবে।

(৬৫). যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, নামায আদায় করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে (সৎকাজে) ব্যয় করে গোপনে ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসায়ের আশাবাদী, যাতে কখনও লোকসান হয় না (ফাতির ২৯)।

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ أَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

আল্লাহর কিতাব পাঠ করা লাভজনক ব্যবসা।

(৬৬). সবকিছুর যেমন প্রাণ আছে, কলবেরও প্রাণ আছে। কুরআন হলো সে প্রাণ। কুরআন কলবকে নূর হেদায়াত আদব প্রাণশক্তি সরবরাহ করে। হকের উপর অবিচলতা দান করে। অনেক আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত আছে।

(৬৭). আমি মানুষের কল্যাণার্থে এসব দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকি, কিন্তু তা বোঝে কেবল তারা, যারা জ্ঞানবান (আনকাবূত ৪৩)।

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

তাদাব্বুরকারীদের প্রশংসা করা হয়েছে এই আয়াতে। তাদেকে জ্ঞানী বলেও স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কারণ আল্লাহর বর্ণনা করা মেসাল (দৃষ্টান্ত) যে তারাই শুধু বোঝেন!

(৬৮). কিছু সময় একান্তে নিজের সাথে কাটাব। প্রশ্ন করবো, আমি কি তাদাব্বুর করি? এ-ব্যাপারে আমার শিথিলতা আছে? থাকলে আজ থেকে শুরু করবো। নিজে নিজে নয়। ওস্তাদের অধীনে। সালাফের রেখে যাওয়া আদর্শের উপর থেকে।

(৬৯). তাদাব্বুরের জন্যে ইখলাস ও নিয়তকে বিশুদ্ধ করা জরুরী। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

-তাদেরকে কেবল এই আদেশই করা হয়েছিল যে, তারা আল্লাহর ইবাদত করবে, আনুগত্যকে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্যে খালেস রেখে (বায়্যিনা: ৫)।

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء

(৭০). তাদাব্বুরের আগে নিয়ত করে নিতে হবে।

—— আমাকে যেন সরল পথে পরিচালিত করা হয়। কারণ কুরআন হলো ঈমানদারদের জন্যে হোদায়ত ও রহমত (নামল ৭৭)।

وَ إِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

কুরআন কারীম আঁকড়ে ধরে থাকলেই আমরা সরল পথের উপর থাকতে পারবো। এটা নবীজি সা.-ও বলে গেছেন। আমি তোমাদের মাঝে দুটি বস্তু রেখে যাচ্ছি। সে দু'টি আঁকড়ে ধরলে কিছুতেই বিচ্যুত হবে না:

ক. আল্লাহর কিতাব।

খ. আমার সুন্নাত

تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما : كتاب الله و سنتي

(৭১). তাদাব্বুরের সময় নিয়ত করবো, আমি যেন আল্লাহর পরিবারভুক্ত ও খাসলোক হতে পারি:

إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته

আল্লাহর পরিবারভুক্ত বিশেষ কিছু মানুষ আছে! তারা কারা? তারা আহলে কুরআন! (আহমাদ)।

(৭২). আমি কুরআন কারীম নিয়ে লেগে থাকছি, কুরআন কারীম আমার জন্যে সুপারিশকারী হয়:

—— তোমরা কুরআন পড়ো। কারণ কুরআন কেয়ামতের দিন তার ধারকদের জন্যে সুপারিশকারী হবে (মুসলিম)।

اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحاب

কুরআনের তাদাব্বুর যে করে, তার চেয়ে বেশি কুরআনের ধারক আর কে হতে পারে?

(৭৩). তাদাব্বুরের সময় ভাবব, আল্লাহর যিকির দ্বারা আমি যেন প্রশান্তচিত্ত হতে পারি!

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

এরা সেই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর আল্লাহর যিকিরে প্রশান্তি লাভ করে। স্মরণ রেখ, কেবল আল্লাহর যিকিরই সেই জিনিস, যা দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি লাভ হয় (রা'দ: ২৮)।

(৭৪). তাদাব্বুরের সময় নিয়ত করবো, আমি যেন যাবতীয় রোগ বালাই থেকে শিফা লাভ করি। কারণ কুরআন তো আমাদের জন্যে শি'ফা।

(৭৫). তাদাব্বুরের সময় নিয়ত করবো, আমি যেন আনুগত্যের উপর অবিচল থাকতে পারি:

كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا

(হে নবী!) আমি এরূপ করেছি এর মাধ্যমে আপনার অন্তর মজবুত রাখার জন্যে আর আমি এটা পাঠ করিয়েছি থেমে থেমে (ফুরকান ৩২)।

(৭৬). তাদাব্বুরের আরেকটি মাধ্যম হলো শব্দের অর্থ বোঝা! তাদাব্বুরের জন্যে কুরআন কারীমের অর্থ বুঝতে হবে!

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

-বস্তুত আমি এ কুরআনে মানুষের জন্যে সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে। এটা আরবী কুরআন, এতে কোনও বক্রতা নেই, যাতে মানুষ তাকওয়া অবলম্বন করে (যুমার: ২৭-২৮)।

—— আরবী না বুঝলে কিভাবে তাদাব্বুর করবে? একজন অত্যন্ত বড় আলিম বলেছেন: তিলাওয়াতের সময় কোনও আয়াত না বুঝতে পারলে, ভীষণভাবে মুষড়ে পড়ি। একজন আলিমের যদিএমন অনুভূতি হয়, আমার মতো যারা সাধারণ, তাদের কী অবস্থা হওয়া উচিত!

(৭৭). সাহাবায়ে কেরাম কোনও আয়াতের অর্থ বুঝতে না পারলে, থেমে যেতেন। না বুঝে সামনে অগ্রসর হতেন না। ইবনে যোবায়ের রা. বলেছেন, একটা আয়াত বুঝতে পারছিলাম না। নির্ঘুম রাত কেটে গেল। সকালে ইবনে আব্বাস রা. বুঝিয়ে দিয়েছেন। আয়াতটি ছিল:

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ

তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন যে, তারা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখলেও তা এভাবে যে, তাঁর সঙ্গে শরীক করে (ইউসুফ ১০৬)।

(৭৮). তাদাব্বুর করতে বসলে:

ক. তাদাব্বুরের সময় মূল কুরআনের পাশে তরজমা ও তাফসীর আছে এমন ‘মুসহাফ’ নিয়ে বসা।

খ. সাথে কাগজ রাখা। কোনও প্রশ্ন জাগলে সেটা টুকে রাখা। পরে জেনে নেয়ার জন্যে।

গ. এভাবে পড়তে গিয়ে যদি একপৃষ্ঠা শেষ করতে যদি দীর্ঘ সময়ও লেগে যায় বিরক্ত না হওয়া।

(৭৯). তাদাব্বুরের জন্যে একটা আয়াতকে বারবার আওড়ানো।

তামীম দারী রা. একটা আয়াত পড়তে পড়তে পুরো রাত কাটিয়ে দিয়েছেন; **أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ**

যারা অসৎ কার্যাবলীতে লিপ্ত হয়েছে, তারা কি ভেবেছে আমি তাদেরকে সেই সকল লোকের সম গণ্য করব, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, ফলে তাদের জীবন ও মরণ একই রকম হয়ে যাবে? তারা যা সিদ্ধান্ত করে রেখেছে তা কতই না মন্দ (জাসিয়া: ২১)।

—— সালাফের অভ্যেসই ছিল এমন। তারা একটি আয়াত নিয়ে রাত ভোর করে দিয়েছেন।

(৮০). কুরআন পাঠের সময় কল্পনা করা, আমি এখন ররেব কালাম পড়তে যাচ্ছি। আল্লাহর বড়ত্ব ও মহত্ব মনে হাজির রাখা। যদি পড়ার সময় তাদাব্বুরের দিকে মন না যায়, বারবার পড়তে থাকা। সায়ীদ ইবনু জোবায়ের রহ. একটা আয়াতকে বিশবারেরও বেশি পড়েছেন:

وَ اتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ

এবং তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যখন তোমরা সকলে আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে (বাকারা: ২৮১)।

(৮১). তাদাব্বুরের জন্যে তারতীরে সাথে পড়া। আলকামাহ খুব তাড়াহুড়ো করে কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। ইবনে মাসউদ দেখে বললেন:

رتل فإنه زين القرآن

তারতীলের সাথে ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করো। কারণ এভাবে পড়ার মাঝেই কুরআনের সৌন্দর্য নিহিত! (বায়হাকী)।

(৮২). হাফসা রা. বলেছেন: আল্লাহর রাসূল থেমে থেমে তিলাওয়াত করতেন। তার তিলাওয়াত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকতো (মুসলিম)।

(৮৩) আমি কুরআনকে আলাদা আলাদা অংশ করে দিয়েছি, যাতে আপনি মানুষের সামনে থেমে থেমে পড়তে পারেন আর আমি এটা নাযিল করেছি অল্প-অল্প করে (ইসরা: ১০৬)।

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا

নাযিলই করা হয়েছে ধীরে ধীরে। এবং তিলাওয়াতও করতে হবে ধীরে ধীরে! থেমে থেমে!

(৮৪)তাদাব্বুর করতে বসলে, নিজেকে শুনিয়ে তিলাওয়াত করবো। বেশি জোরে নয় আবার। আবার ফিসফিস করেও নয়।

-আপনি নিজের নামাজ বেশি উঁচু স্বরে পড়বেন না এবং অতি নিচু স্বরেও নয়; বরং উভয়ের মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করবেন (ইসরা: ১১০)।

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا

(৮৫). হাদীস শরীফেও সুন্দর কথা আছে:

مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَسَنِ الصَّوْتِ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ ، يَجْهَرُ بِهِ

নবী সুর করে জোর আওয়াজে কুরআন-পাঠ আল্লাহ তা'আলা খুবই আগ্রহ করে শোনেন। অন্য কিছু এতটা আগ্রহের সাথে শোনেন না (মুত্তাফাক)।

(৮৬). একরাতে নবীজি বের হলেন। আবু বাকরকে দেখলেন নিম্নস্বরে নামাজে কুরআন তিলাওয়াত করছেন। উমারকে দেখলেন উচ্চ আওয়াজে নামাজে তিলাওয়াত করছেন। পরে আবু বকরকে বললেন

-তোমাকে দেখলাম মৃদুস্বরে তিলাওয়াত করছ!

-যার উদ্দেশ্যে তিলাওয়াত করছি, তিনি তো আস্তে বললেও শোনেন!

-আর উমার! তোমাকে দেখলাম বেশ জোরে তিলাওয়াত করছ?

-ঘুমন্তদের জাগিয়ে দেয়ার জন্যে, শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্যে!

-আবু বাকর তুমি আরেকটু জোরে পড়বে! উমার তুমি আরেকটু নিচু আওয়াজে পড়বে! (তিরমিযি)

(৮৭). তাদাব্বুরের সময় সাধ্যানুযায়ী সুরেলা কণ্ঠে কুরআন পড়া।

নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে সুর করে কুরআন পাঠের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। যারা সুর করে কুরআন পাঠ করতেন, তাদের প্রশংসা করতেন।

إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله

-যার কুরআন পাঠ শুনলে মনে, সে আল্লাহকে ভয় করে করে পড়ছে, সেই সবচেয়ে সুন্দর তিলাওয়াতকারী (ইবনে মাজাহ)।

(৮৯). তোমরা কুরআন পড়ার সময় স্বরকে সুন্দর করো (আবু দাউদ)।

زينوا القرآن بأصواتكم

(৯০). যে ব্যক্তি কুরআনকে সুন্দর করে পড়ে না, সে আমাদের দলভুক্তই নয় (মুসলিম)

ليس منا من لم يتغن بالقرآن

(৯১). বারা বিন আযিব রা. বলেছেন:

নবীজি ঈশার নামাজে সূরা ত্বীন পড়েছেন। তার চেয়ে সুন্দর স্বর আর কারো শুনিনি (মুত্তাফাক)।

(৯২). কুরআনকে সুন্দর করে পড়লে, ভাবটা হৃদয়ে ছাপ ফেলে। গলা সুন্দর না হলেও, সাধ্যমতো সুন্দর করার চেষ্টা করা।

(৯৩). আবু মুসা আশ'আরী রা.-এর কুরআন পাঠ খুবই সুন্দর ছিল। নবীজি তার প্রশংসা করে বলেছেন:

-তোমাকে দাউদী বাঁশীর সুরের কিছুটা দেয়া হয়েছে!

-ইশ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি জানতাম আপনি আমার কুরআন-পাঠ শুনছেন তাহলে আরও সুন্দর করে পড়ার চেষ্টা করতাম!

(৯৪). কুরআন কারীমকে সুর করে পড়া দু'প্রকার:

ক. স্বাভাবিক সুর। কৃত্রিমতা নেই। এটা প্রশংসিত।

খ. কৃত্রিম সুর। গানের মতো করে পড়া। এটা নিন্দনীয়।

(৯৫). তাদাব্বুরের জন্যে কুরআন পড়তে বসার আগে গুনাহমুক্ত হয়ে নেয়া। অহংকার হিংসা ও অন্যান্য আত্মিক রোগ থেকে শুদ্ধ হয়ে নেয়া। কারণ এগুলো হলো মরিচা। কুরআনকে কলবে প্রবেশ করতে দেয় না। কুরআন কারীমে আছে:

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে অহংকার প্রকাশ করে, তাদেরকে আমি আমার নিদর্শনাবলী হতে বিমুখ করে রাখব (আ'রাফ: ১৪৬)।

মনে অহংকার থাকলে কুরআনের আলো কলবে প্রবেশ করবে না।

(৯৬). ইবনে কুদামা রহ. বলেছেন:

-কুরআন বোঝার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক তিনটি:

ক. গুনাহে লেগে থাকা।

খ. অহংকার থাকা।

গ. প্রবৃত্তির পূজারী হওয়া।

এগুলো কলবকে জং ধরিয়ে দেয়।

(৯৭). তাদাব্বুরের জন্যে কুরআন কারীমকে মুখস্থ পড়া। তাদাব্বুরের জন্যে এটা অত্যন্ত উপকারী।

একজন দেখে পড়ে তাদাব্বুর করছে, আরেকজন মুখস্থ পড়ে তাদাব্বুর করছে, দু'জনের মধ্যে তুলনাই চলে না। মুখস্থ পড়ার মানে হলো, সে এর আগেও আয়াতটা বহুবার পড়ছে। এই আয়াতের সাথে তার সম্পর্ক অনেক পুরনো। গভীর।
(৯৮). আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

প্রকৃতপক্ষে এ কুরআন এমন নিদর্শনাবলীর সমষ্টি, যা জ্ঞানপ্রাপ্তদের অন্তরে সুস্পষ্ট (আনকাবূত ৪৯)।

আল্লাহর আয়াত যাদের বক্ষে ধারণ করা আছে, তাদের চেয়ে সেরা আর কে হতে পারে!

(৯৯). নবীজি বলেছেন:

لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل و آناء النهار

হিংসা নিন্দনীয়, তবে দু'টি ব্যাপারে হিংসা (গিবতা) চলতে পারে, তার একটি হলো:

এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কুরআন দান করেছেন, সে রাতে ও দিনে কুরআন পড়ে! (তাকে এ-কাজের জন্যে ঈর্ষা করা যেতে পারে) মুসলিম।

(১০০). সাহল বিন আবদুল্লাহ এক ছাত্রকে প্রশ্ন করলেন:

-তুমি কুরআন হিফজ করেছ?

-জ্বি না!

-কুরআন হিফজ করে না এমন মুমিনের জন্যে আফসোস! কুরআন হিফজ না করলে সে দিয়ে সুর করবে, আনন্দ লাভ করবে?

(১০১). নিজের হিফজ থেকে মুখস্থ তাদাব্বুর করার বড় সুবিধা হলো, ইচ্ছেমতো যে কোনও সময় তাদাব্বুর করতে পারা। ইচ্ছেমতো কুরআন কারীম থেকে আয়াত বের করে আনতে পারা!

হাঁ, দেখে দেখে পড়লে সওয়াব বেশি।

প্রথমত, পড়ার ইবাদত

দ্বিতীয়ত, কুরআন কারীমের দিকে তাকানোর ইবাদত।

তবে আমরা বলছি তাদাব্বুরের কথা। তিলাওয়াতের কথা নয়। তাদাব্বুর মুখস্থ করাই বেশি ফলদায়ক। তবে কথা হল, আমার যদি দেখে দেখে তাদাব্বুর করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হয়, তাহলে দেখে দেখে তাদাব্বুর করাই আমার জন্যে উত্তম। মুখস্থ পড়ার বাড়তি উপকার হলো, মনটা বিক্ষিপ্ত হওয়ার সুযোগ কম থাকে।

.

(১০২). তাদাব্বুরের জন্যে সহায়ক হলো, তাহাজ্জুদে কুরআন পাঠ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَ أَقْوَمُ قِيلًا

অবশ্যই রাত্রিকালের জাগরণ এমনই কর্ম যা দ্বারা কঠিনভাবে প্রবৃত্তির দলন হয় এবং কথাও বলা হয় উত্তমভাবে (মুযযাম্মিল ৬)।

(১০৩). রাতের গভীরে তিলাওয়াত সত্যিই প্রভাবশালী। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন:

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ

তবে কি (এরূপ ব্যক্তি সেই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে,) যে রাতের মুহূর্তগুলোর ইবাদত করে,কখনও সিজদাবস্থায়, কখনও দাঁড়িয়ে, যে আখেরাতকে ভয় করে এবং নিজ প্রতিপালকের রহমতের আশা করে? বল, যে ব্যক্তি জানে আর যে জানে না উভয়ে কি সমান? (যুমার: ৯)।

(১০৪). নবীজি সা. বলেছেন:

الصيام و القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة ... يقول القرآن : رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان

সিয়াম ও কুরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্যে সুপারিশ করবে। কুরআন বলবে: রাব্বি, আমি তাকে রাতে ঘুমুতে বাধা দিয়েছি, আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন! (আহমাদ)।

(১০৫). অন্তত দু'রাকাত হলেও তাহাজ্জুদ পড়া দরকার। ছোট্ট একটা সূরা হলেও তাদাব্বুর করে করে তিলাওয়াত করতে খুব বেশি সময় লাগার কথা নয়!

(১০৬). তাদাব্বুরের স্তর আছে:

চিন্তা-ভাবনা ও শিক্ষাগ্রহণ। কুরআন কারীমের বহু আয়াতে এদিকে ইশারা আছে: হয়তো তোমরা চিন্তা করবে (**لعلكم تتفكرون**)।

চিন্তাশীল কওমের জন্যে রয়েছে নিদর্শনাবলী (**لآيات لقوم يتفكرون**) ।

(১০৭). সূরা আলে ইমরানের শেষদিকের আয়াতগুলো নাযিল হলে, নবীজি কেঁদে দিয়ে বললেন;

لقد نزلت عليَّ الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها

আজ রাতে আমার উপর একটা আয়াত (১৯০) নাযিল হয়েছে। দুর্ভোগ! যে এই আয়াত পড়বে অথচ আয়াতটা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না!

(১০৮). ফিকর হলো কলবের আমল। কলবের নূর হলো চিন্তা-অনুধ্যান। তাদাব্বুর মানে একটা আয়াত নিয়ে চিন্তা করা। আয়াতের শব্দগুলো নিয়ে ভাবা। শব্দটা কী কী অর্থ হতে পারে!

(১০৯). আমি তাদাব্বুর করার সময় ভাববো, আমার অবস্থার সাথে সালাফের অবস্থা তুলনা করে দেখবো। একটা আয়াতে কোনও গুণাবলীর কথা বর্ণিত হলে, সেটা আমার মধ্যে আছে কি না, যাচাই করে দেখবো। নিজেকে প্রশ্ন করবো: আমি কি প্রকৃত মুমিন? সূরা আনফালের শুরুতে বলা মুনিনের গুণাবলী কি আমার মধ্যে আছে?

(১১০). তাদাব্বুরের আরেকটি স্তর হলো:

কুরআন কারীম দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ও হৃদয় বিগলিত হওয়া।

আয়াত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও তাদাব্বুরের পর আমার কলবে কোনও প্রভাব পড়ে? আমার চিত্তের কোনও ধরনের উত্তরণ ঘটেছে? চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়েছে? মনটা নরম হয়েছে?

(১১১). নবীজি মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আবু বকরকে ইমামতি করার জন্যে খবর পাঠালেন। আয়েশা রা. বললেন:

-আবু বকর কোমল হৃদয়ের মানুষ! নামায পড়াতে গেলে কান্না রোধ করতে পারবে না! (কুরআন পাঠ করতে গেলে, কান্না চলে আসবে)।

(১১২). হাসান বসরী রা. বলেছেন: মিষ্টতা খোঁজ তিন বস্তুতে! সালাতে, কুরআনে ও যিকিরে। যদি মিষ্টতা পাও, ভাল কথা। নইলে জেনে রাখ তোমার জন্যে আল্লাহর রহমতের দরজা বন্ধ! খোলার ব্যবস্থা করো!

(১১৩). তাদাব্বুরের আরেকটি স্তর হলো:

সাড়াদান ও আনুগত্য! আমি যা পড়ছি, তা মানছি তো? আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

(হে মানুষ!) তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে যে কিতাব নাযিল করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর (আ'রাফ: ৩)।

(১১৪). সাহাবায়ে কেরাম দশটা আয়াত শিখতেন। সেগুলোর উপর আমল না করে সামনে বাড়তেন না। তারা প্রতিটি আয়াত নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করতেন।
(১১৫). সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেছেন: মায়েদার ৬৮তম আয়াতটাকে আমার অত্যন্ত ভারী মনে হতো:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ

বলে দাও, হে কিতাবীগণ! তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত ও ইঞ্জিল এবং (এখনও) যে কিতাব তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে, তার যথাযথ অনুসরণ না করবে, ততক্ষণ তোমাদের কোনও ভিত্তি নেই!
এ-আয়াতে যথাযথ অনুসরণ মানে 'বোঝা ও আমল করা! আমরা কি কুরআন কারীমকে যথাযথ বুঝছি? আমল করছি?

(১১৬). ইবনে মুফলিহ রহ. বলেছেন:

তোমার ঘরে কুরআন কারীম আছে, আর তুমি কুরআনে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞাগুলোতে দেদারসে লিপ্ত হচ্ছো, আমার ভয় হয়, তুমি এই আয়াতের হুমকির আওতায় চলে আসো কি না!

فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ

অতঃপর তারা এ প্রতিশ্রুতিকে তাদের পেছন দিকে ছুড়ে মারে (আলে ইমরান ১৮৭)।

(১১৭). আমি কুরআন পড়ি কিন্তু মানি না, তাহলে আমি বড় জালিম:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং নিজ কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়? বস্তুত আমি (তাদের কৃতকর্মের কারণে) তাদের অন্তরের উপর ঘেরাটোপ লাগিয়ে দিয়েছি, যদ্দরুণ তারা এ কুরআন বুঝতে পারে না এবং তাদের কানে ছিপি এঁটে দিয়েছি। সুতরাং তুমি তাদেরকে হিদায়াতের দিকে ডাকলেও তারা কখনও সৎপথে আসবে না (কাহফ: ৫৭)।

(১১৮). তাদাব্বুর করলেই হবে না, কুরআনের হুকুমকে মাথা পেতে গ্রহণ করতে হবে:

خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا

আমি তোমাদেরকে যা-কিছু দিয়েছি তা শক্ত করে ধর। এবং (যা-কিছু বলা হয়, তা) শোন (বাকারা ৯৩)।

(১১৯). আমরা কিভাবে কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হতে পারি? কুরআনের প্রতি গভীর আস্থা ও অনুরাগ। বিশ্বাস করা, এই কুরআন আল্লাহর কালাম।

(১২০). পূত-পবিত্র গুনাহমুক্ত জীবন যাপন করা। যার কলবটা জীবন্ত সেই কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়।

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا

এটা তো এক উপদেশবাণী এবং এমন কুরআন যা সত্যকে সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে। যাতে প্রত্যেক জীবিতজনকে সতর্ক করে দেয় (ইয়াসীন ৬৯-৭০)।

(১২১). মনোযোগ দিয়ে কুরআন কারীম শোনা। তাহলে কলবটা নরম হবে। প্রভাবিত হবে। তাদাব্বুরটা আন্তরিক হবে।

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ

এই ঘটনাকে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বানানোর জন্যে এবং যাতে এটা (শুনে) স্মরণ রাখে সেই কান, যা স্মরণ রাখতে সক্ষম (হাক্কাহ: ১২)।

(১২২). সুফিয়ান ইবনু উয়াইনা রহ. বলেছেন:

-ইলমের সূচনা হলো শোনার মাধ্যমে। তারপর বোঝা তারপর মুখস্থ তারপর আমল তারপর প্রচার।

আমি কোন ধাপে আছি? কুরআন কারীমকে শুধুই শুনছি? শুধুই মুখস্থ করছি? আমল করছি? প্রচার করছি?

(১২৩). কুরআন কারীমকে ভাল করে বুঝতে হলে ভাল করে শুনতে হবে:

والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوالألباب

যারা তাগুতের পূজা পরিহার করেছে ও আল্লাহর অভিমুখী হয়েছে, সুসংবাদ তাদেরই জন্য। সুতরাং আমার সেই বান্দাদেরকে সুসংবাদ শোনাও। যারা কথা শোনে মনোযোগ দিয়ে, অতঃপর তার মধ্যে যা-কিছু উত্তম তার অনুসরণ করে, তারাই এমন লোক, যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন (যুমার ১৭-১৮)।

= এ-আয়াতে মনোযোগ দিয়ে শোনার কথা বলা হয়েছে।

(১২৪). আল্লাহর প্রশংসিত বান্দা কারা?

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا

এবং যখন তাদের প্রতিপালকের আয়াত দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা বধির ও অন্ধরূপে তার উপর পতিত হয় না (ফুরকান: ৭৩)।

(১২৫). মনোযোগ দিয়ে শোনা মুমিনের লক্ষণ পক্ষান্তরে কাফেরের লক্ষণ? **كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ**

আরবী কুরআনরূপে এটি এমন কিতাব, জ্ঞান অর্জনকারীদের জন্যে যার আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে। এ কুরআন সুসংবাদদাতাও এবং সতর্ককারীও বটে। তা সত্ত্বেও তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ফলে তারা শুনতে পায় না (ফুসসিলাত ৩-৪)।

(১২৬). কাফেররা সব সময়ই কুরআনবিমুখ:

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

এবং কাফেররা (একে অন্যকে) বলে, এই কুরআন শুনো না এবং এর (পাঠের) মাঝে হট্টগোল কর, যাতে তোমরা জয়ী থাক (ফুসসিলাত: ২৬)।

(১২৭). না শোনার মানসিকতার অধিকারীকে আল্লাহ হুমকি দিয়েছেন: **وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ**

দুর্গতি হোক প্রত্যেক এমন মিথ্যুক পাপিষ্ঠের- যে আল্লাহর আয়াতসমূহ শোনে, যখন তাকে পড়ে শোনানো হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে ঔদ্ধত্যের সাথে এমনভাবে (কুফরের উপর) অটল থাকে, যেন আয়াতসমূহ শোনেইনি। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে যন্ত্রণাময় শাস্তির সুসংবাদ শোনাও (জাসিয়া: ৭-৮)।

(১২৮). তারা আল্লাহর আয়াত না শোনার কারণে অচিরেই অনুতপ্ত হবে। কিন্তু সেটা তাদের কোনও কাজে আসবে না:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ

এবং তারা বলবে, আমরা যদি শুনতাম এবং বুদ্ধিকে কাজে লাগাতাম, তবে (আজ) আমরা জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম না। এভাবে তারা নিজেরা নিজেদের গোনাহ স্বীকার করবে (মুলক ১০-১১)।

(২২৯). কুরআন কারীমকে উপেক্ষা করার মতো বড় পাপ আর হতে পারে না:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় জালেম আর কে হতে পারে, যাকে তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা নসীহত করা হলে সে তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমি অবশ্যই এরূপ জালেমদের থেকে বদলা নিয়ে ছাড়ব (সাজদা ২২)।

(১৩০). আল্লাহ আমার ডাকে কখন সাড়া দেবেন?

إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ

কথা তো কেবল তারাই মানতে পারে, যারা (সত্যের আকাঙ্খী হয়ে) শোনে (আনআম :৩৬)।

———সত্যের অন্বেষী হয়ে শুনলে, উপকৃত হবেই।

(১৩১). আমি যদি মুমিন হই, তাহলে কুরআন আমার জন্যে। আমাকে মনে করতে হবে, কুরআন আমাকেই সম্বোধন করছে:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

নিশ্চয়ই তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্যে শিক্ষা গ্রহণের উপাদান রয়েছে। এটা এমন কোনও বাণী নয়, যা মিছামিছি গড়ে নেয়া হয়েছে। বরং এটা এর পূর্ববর্তীদের কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং যারা ঈমান আনে তাদের জন্যে হিদায়াত ও রহমতের উপকরণ (ইউসুফ: ১১১)।

(১৩২). ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন:

কুরআন তিলাওয়াতকালে যখনই তুমি দেখবে

হে মুমিনগণ! (**يا أيها الذين آمنوا**)!

তুমি পরিপূর্ণ সজাগ হয়ে যাবে। সামনে কী বিধান আসছে সেটার গ্রহণ করার জন্যে। আদেশ হলে মেনে নিবে। নিষেধ হলে বিরত থাকবে।

(১৩৩). ইবনে কুদামাহ বলেছেন:

-কুরআন পাঠকারীর জানা উচিত, কুরআনের সম্বোধনের উদ্দেশ্য কী? হুমকিগুলোর উদ্দেশ্য কী? কুরআনের গল্পগুলো নিছক সময় কাটানোর জন্যে বিবৃত হয় নি। শিক্ষাগ্রহণ করার জন্যে বর্ণিত হয়েছে। মনে করবে, আমি দাস, মনিবের পক্ষ থেকে চিঠি এসেছে। সেটা পড়ছি।

(১৩৪). ইমাম গাযালী বলেছেন:

-ভয়ের আয়াত পড়ার সময় এমন ভান করতে হবে, যেন ভয়ে মরে যাচ্ছি। আনন্দের আয়াত এলে এমন ভাব করতে হবে, যেন আনন্দে আকাশে উড়ছি! আল্লাহর গুণাবলীর আয়াত এলে মাথা নিচু করে দিতে হবে। আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের নিদর্শনস্বরূপ। কাফেরদের বৈশিষ্ট্য এলে, লজ্জার ভান করে আওয়াজ নিচু করে ফেলতে হবে। যেন তাদের এহেন কর্মকাণ্ডে আমারও মাথা কাটা যাচ্ছে।

.

(১৩৫). প্রতিটি আয়াতেই আমি থামব। ভাবব। মুমিনদের বৈশিষ্ট্য হলে, চিন্তা করে দেখব, আমি কি গুণের অধিকারী? কাফির বা মন্দলোকদের বৈশিষ্ট্য হলে চিন্তা করবো, আমি নইতো! আল্লাহর বড়ত্বের বর্ণনা হলে, চিন্তা করব, আমি কি তা অনুভব করতে পারছি? আমার মনে কি গাইরুল্লাহর প্রতি ভালবাসা আছে?

(১৩৬). কুরআন তাদাব্বুরের ক্ষেত্রে আরেকটি বড় প্রতিবন্ধক হলো, তাজভীদের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ! তাজভীদের সূক্ষাতিসূক্ষ ভুল বের করার প্রয়াস চালানো। হরফের মাখরাজের দিকে অতিরিক্ত নজর দিলে হরফের অর্থ বের হবে না। এ-ধরনের পড়া শয়তানের হাসির খোরাক হবে। এটা ঠিক, তাজভীদ অত্যন্ত জরুরী বিষয়। তাজভীদ কুরআন পাঠের অলংকার। তাজভীদ ঠিক করে পড়তে না পারলে গুনাহগার হবে। কিন্তু এটাই কুরআনের চূড়ান্ত লক্ষ্য নয়। তাজভীদ হলো মাধ্যম। তাদাব্বুরের স্তরে পৌঁছার সেতু। কুরআন পাঠের সময় শয়তানের একটা শক্তিশালী অস্ত্র হলো, সে তিলাওয়াতকারীর মনে দ্বিধা ঢুকিয়ে দেয়: হরফটা বোধ হয় সঠিকভাবে আদায় করা হয়নি! আবার শুদ্ধ করে পড়ি! হরফ শুদ্ধ করার দিকে তার মনোযোগ ফিরিয়ে, অর্থের দিক থেকে তার মনোযোগ ঘুরিয়ে দেয়।

(১৩৭). ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন:

-এক জমানা আসবে, ফকীহ কম হবে ক্বারী বেশি হবে। কুরআন কারীমের হরফ মুখস্থ করা হবে, কিন্তু তার বিধি-বিধান অবহেলিত থাকবে!

(১৩৮). তাদাব্বুরের আরেকটি প্রতিবন্ধক হলো:

-কুরআন দ্বারা নিছক শিফা বা আরোগ্য লাভ করার নিয়ত করা। কিছু মানুষ কুরআন কারীমকে হোমিও-এলোপ্যাথির দোকান বানিয়ে রাখে। তারা মনে করে রোগ-বালাই থেকে শেফা দেয়ার জন্যেই কুরআন নাযিল হয়েছে। এটা ঠিক, কুরআন শারীরিক-মানসিক-বুদ্ধিবৃত্তিক সব ধরনের রোগ ভালো করার ক্ষমতা রাখে। তাই বলে আরোগ্য দান করাই কুরআনের প্রধান উদ্দেশ্য নয়।

(১৩৯). তিলাওয়াত করতে গিয়ে আল্লাহর নামগুলো সামনে পড়লেই থমকে গিয়ে ভাবা, এখানে অন্য নাম না এনে ঠিক এই নামই কেন আনা হল?

(১৪০). কোত্থেকে তাদাব্বুর শুরু করবো? উমার রা. বলেছেন:

-তোমরা যদি কুরআন শিখতে চাও, 'মুফাসসাল' সুরা থেকে শুরু করো। কারণ এগুলো ছোট ও সহজ।

(১৪১). ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন:

-নবীজি সা. যখন ইন্তেকাল করেন, তখন আমি দশ বছরের বালক। আমি সবে মুহকাম ও মুফাসসাল সূরাগুলো পড়ে শেষ করেছি।

মুফাসসাল সূরা হলো: সূরা ক্বফ থেকে নাস পর্যন্ত। এ-সূরাগুলো দিয়ে পাঠ শুরু করার বেশ কিছু উপকারিতা রয়েছে:

ক. কলবে ঈমান পোক্ত হয়। কারণ এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে উপদেশমূলক আয়াত আছে।

খ. ছোট ছোট আয়াত হওয়াতে বোঝার ক্ষেত্রেও সহায়ক। এসব আয়াতে শরীয়তের বিধিবিধানও খুব একটা নেই। বেশির ভাগই জান্নাত-জাহান্নামের বর্ণনা। নবী-রাসূলগণের ঘটনা।

গ. আল্লাহর পরিচয়মূলক আয়াত আছে। আল্লাহর প্রতি ঈমানের কথা আছে।

ঘ. রাসূলের ঈমানের কথা আছে।

(১৪২). তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, নাকি অন্তরে লেগে আছে সেই তালা, যা অন্তরে লেগে থাকে? (মুহাম্মাদ: ২৪)।

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

ক. এই আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, কুরআন কারীম নিয়ে তাদাব্বুর করা ওয়াজিব (ইমাম শাওকানী)।

খ. তাদাব্বুর ছেড়ে দেয়ার অর্থ কুরআনকে ছেড়ে দেয়া (ইবনে কাসীর)।

গ. আমরা তাদাব্বুর কেন করবো তার উদ্দেশ্যও এই আয়াত থেকে বের করতে পারি।

ঘ. তালাবদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হৃদয়ের মানুষরা তাদাব্বুর থেকে বিমুখ থাকে।

ঙ. পরোক্ষভাবে মুনাফিকদের নিন্দা করা হয়েছে। কারণ তারা কুরআনের তাদাব্বুরকে উপেক্ষা করে থাকে।

(১৪৩). (হে রাসূল!) এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর (আয়াতের) মধ্যে চিন্তা করে এবং যাতে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে (সোয়াদ: ২৯)।

كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থাৎ: হে মুহাম্মাদ! আপনার কওমের মধ্য হতে যাদের প্রতি আমি এই কুরআন নাযিল করেছি, তারা যেন 'তাদাব্বুর' করে (তাবারী)।

(১৪৪). যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা যখন তা সেভাবে তিলাওয়াত করে, যেভাবে তিলাওয়াত করা উচিত তখন তারাই তার প্রতি (প্রকৃত) ঈমান রাখে (বাকারা: ১২১)।

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ

যথার্থ তিলাওয়াত (**حَقَّ تِلَاوَتِهِ**) মানে? মুফাসসিরীনগণ বলেছেন, এর অর্থ 'তাদাব্বুর' করা ও সে অনুযায়ী আমল করা।

(১৪৫). এবং ধীর-স্থিরভাবে স্পষ্টরূপে কুরআন তিলাওয়াত কর

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا

ক. এভাবে তিলাওয়াত করলে, কুরআন কারীম বুঝতে ও তাদাব্বুর করতে সহায়ক হবে (ইবনে কাসীর)।

খ. ধীরে ধীরে তাদাব্বুরের সাথে পড়তে থাক (শাওকানী)।

(১৪৬). আল্লাহ কারও উপর সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব অর্পণ করেন না (বাকারা: ২৮৬)।

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا

কুরআনের বিধি-বিধান বোঝা যদি আমাদের সাধ্যের বাইরে হতো, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাদাব্বুরের হুকুম দিতেন না (ইবনে হাযম)।

(১৪৭). আল্লাহ তা'আলা যাকে কল্যাণ দান করতে চান, তাকে দ্বীনের 'তাফাক্কুহ' (গভীর বুঝ) দান করেন (মুত্তাফাক)।

من يرد الله به خيراً يفقه في الدين

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন: দ্বীনের 'ফিকহ'-গভীর জ্ঞান হাসিলের সবচেয়ে বড় উপায় হলো, কুরআন কারীমের তাদাব্বুর।

(১৪৮). সাহাবায়ে কেরামের কুরআনি তাদাব্বুর ছিল ভিন্নধর্মী। তারা কতোটা মনোযোগ দিয়ে কুরআনের তাদাব্বুর করতেন, উমার রা. এর ঘটনা তার স্বাক্ষী। তিনি বারো বছর সময় ব্যয় করে সূরা বাকারা শিখেছেন। শেষ হওয়ার পর, আনন্দে উট যবেহ করেছেন (বায়হাকী)।

(১৪৯). আমরা তাফসীর বা তাদাব্বুরে বসলেও কত দ্রুত একেকটা সূরা শেষ হয়ে যায়। আমাদের তাদাব্বুর মানে 'তরজমা'। বেশির চেয়ে বেশি সামান্য তাফসীর। ইবনে উমার রা. সূরা বাকারা নিয়ে আট বছর পড়ে ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়টা তিনি সূরাটা শেখার পেছনে ব্যয় করেছেন (মুয়াত্তা)।

(১৫০). উমার রা. নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কোনও কোনও আয়াতের তাদাব্বুর তাকে ভীষণ বিহ্বল করে তুলতো। কাঁদতে কাঁদতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসতো। কান্নার জন্যে দীর্ঘ সময় ঘর থেকে বের হতে পারতেন না। লোকজন মনে করতো তিনি অসুস্থ। সবাই দেখতে আসতো!

(১৫১). আমি সূরা ফাতিহা থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত তিন তিনবার পড়ে শুনিয়েছি ইবনে আব্বাস রা.-কে। প্রতিটি আয়াত পড়া শেষ হলে থেমে আমি তাকে প্রশ্ন করেছি। আয়াতটা সম্পর্কে তার কাছ থেকে ইলম হাসিল করেছি।

—— মুজাহিদ রহ.)।

(১৫২). হিজরী চতুর্থ হিজরীর বিখ্যাত বুযুর্গ, আবুল আব্বাস বিন আতা রহ.। বেশি বেশি কুরআন খতম করতেন। একটা খতম শুরু করেছিলেন তাদাব্বুর করে করে শেষ করবেন। দশ বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছে। খতম শেষ করার আগেই মালাকুল মাউত এসে হাজির হয়ে গেছেন।

(১৫৩). কুরআন তিলাওয়াত করার সময় মনোযোগটা ধরে রাখা। অর্থের দিকে খেয়াল করে করে তিলাওয়াত করা। কুরআন কারীম থেকে কিছু আহরণের চেষ্টা করা। ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেছেন:

-যে ব্যক্তি হেদায়াতের প্রত্যাশী হয়ে কুরআনের তাদাব্বুরে নিয়োজিত হবে, তার সামনে হকের রাস্তা খুলে যাবে।

(১৫৪). তাদাব্বুর-তাফাক্কুর ছাড়া গড়গড় করে বেশি পরিমাণে তিলাওয়াত করা যায়। কিন্তু তাদাব্বুর ও গভীর চিন্তাভাবনা করে অল্প তিলাওয়াত করা আমার কাছে বেশি প্রিয়।

-ইমাম আ-জুররি)।

(১৫৫). তাদাব্বুর ও তাফাক্কুরের সাথে তিলাওয়াত করা সুন্নাত। এটাই কুরআন তিলাওয়াতের অন্যতম প্রদান ও গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাদাব্বুরমাখা তিলাওয়াতের মাধ্যমে বক্ষটা হেদায়াতের জন্যে প্রস্তুত হয়। হৃদয়টা রব্বানী নূরে নূরান্বিত হয় (আল্লামা সুয়ূতী)।

(১৫৬). যার মধ্যে ইলম নেই, ফাহম নেই, তাকওয়া নেই, তাদাব্বুর নেই, সে কুরআনের কোনও স্বাদই পায় না

(ইমাম যারকাশী)।

(১৫৭). কুরআনের ইলম হলো শ্রেষ্ঠ ইলম। সুতরাং কুরআনের বুঝ (ফাহম)-ই হলো শ্রেষ্ঠ বুঝ।

(ইবনুল জাওযী)।

(১৫৮). কুরআনের তাদাব্বুর ছেড়ে দেয়া, কুরআনের অর্থ বোঝার চেষ্টা না করা, কুরআন সম্পর্কে জানাশোনা বাড়ানোর প্রতি আগ্রহী না হওয়াও একপ্রকার (**هجر**) বা কুরআন-ত্যাগ (ইবনুল কাইয়িম)।

(১৫৯). কুরআন কারীমের তাদাব্বুর যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চাবিকাঠি। এর মাধ্যমেই সমস্ত কল্যান লাভ হয়। এর মাধ্যমেই যাবতীয় ইলম আহরিত হয়। এর মাধ্যমেই ঈমান বৃদ্ধি পায়। ঈমানী বৃক্ষের শেকড় গভীরে প্রোথিত হয় (আল্লামা সা'দী)।

(১৬০). কুরআনের তাদাব্বুর করা তোমার জন্যে অপরিহার্য। কুরআন কারীমের অর্থ বোঝা পর্যন্ত তোমাকে এটা চালিয়ে যেতে হবে। কুরআন কারীম আগাগোড়া পড়তে থাকো তাদাব্বুরের সাথে। আগ্রহ নিয়ে। আমলের নিয়তে ।

(শায়খ বায)।

(১৬১). যে ব্যক্তি কুরআনের তাদাব্বুর করবে এবং বেশি বেশি তিলাওয়াত করবে, সে ব্যক্তি লাভবানদের গুণাবলী কী কী তা জানতে পারবে। ক্ষতিগ্রস্তদের গুণাবলী কী কী তাও সে বিস্তারিত জানতে পারবে ।

(ইবনে বায)।

(১৬২). তোমাদের প্রত্যেক এমন ব্যক্তিকে (সতর্ক করছে), যে অগ্রগামী হতে বা পিছিয়ে পড়তে চায় (মুদ্দাসসির: ৩৭)।

لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

এই আয়াতটা তাদাব্বুর করে দেখ। তোমার সামনে স্পষ্ট হয়ে যাবে, কোনও অবস্থাতেই থেমে পড়া যাবে না। সর্বাবস্থাতেই নিজের ঈমানের খোঁজ-খবর রাখতে হবে। আমলের প্রতি নজর রাখতে হবে। পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রতিটি মুহূর্তেই! (শায়খ নাসের উমর)।

এটাই কুরআনী আয়াত তাদাব্বুরের ফায়েদা। আমাকে সচেতন করিয়ে দেবে। আমার ভুলগুলো ভাঙিয়ে দেবে। আমাকে জাগিয়ে রাখবে।

(১৬৩). হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহর সঙ্গে তাকওয়ার নীতি অবলম্বন কর, তবে তিনি তোমাদেরকে (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে) পার্থক্য করার শক্তি দেবেন (আনফাল: ২৯)।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

সত্য আর মিথ্যা পার্থক্য করা সহজ কাজ নয়। বর্তমানে মিথ্যা আসে নানামুখী রূপ নিয়ে। নিরূপণ করা কঠিন কোনটা হক আর কোনটা বাতিল! এই দুর্যোগে প্রকৃত ফুরকানই পারে আমাদের পথ দেখাতে। কুরআনই সেই ফুরকান। পথ দেখতে হলে তাদাব্বুর করতেই হবে।

(১৬৪). তোমাদের প্রতি আল্লাহর ফযল ও রহমত না হলে তোমাদের মধ্যে কেউ কখনও পাক-পবিত্র হতে পারত না (নূর ২১)।

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا

বান্দার প্রতি আল্লাহর অন্যতম রহমত ও ফযল কী? আল্লাহর কালামের তিলাওয়াত ও তাদাব্বুর।

(১৬৫). তিনি তো রহমানই, যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন (রহমান: ১-২)।

الرحمن علم القرآن

তার মানে কুরআন শিক্ষা দেয়াটাও আল্লাহর বড় এক রহমত। কুরআন নিয়ে তাদাব্বুর করা, কুরআন বোঝার জন্যে কিতাবাদি পড়া, কুরআনী রহস্য উদঘাটনের জন্যে সময় ব্যয় করা, রহমতেরই বহিঃপ্রকাশ।

(১৬৬). আল্লাহর যদি জানা থাকত তাদের মধ্যে কোন কল্যাণ আছে, তবে তিনি তাদেরকে অবশ্যই শোনার তাওফীক দিতেন (আনফাল: ২৩)।

ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم

কুরআন কারীমের তাদাব্বুর না করার কারণ এই নয় তো, আল্লাহ আমাকে এই নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করেছেন! তাদাব্বুর না করা, কুরআন কারীমের অর্থ বোঝার জন্যে চেষ্টা না করার পরিণতি কি হতে পারে, এই আয়াতের দিকে খেয়াল করলে, কিছুটা আঁচ করা যেতে পারে!

(১৬৭). যখন কুরআন পড়া হয় তখন তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয় (আ'রাফ: ২০৪)।

وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له و أنصتوا لعلكم ترحمون

আল্লাহর রহমত, অন্তরে প্রশান্তি, সৌভাগ্য ও ঈমানের উপর অবিচলতা, রোগমুক্তি আসতে পারে, কুরআন কারীমের তিলাওয়াত মনোযোগ দিয়ে তাদাব্বুরের সাথে শোনার মাধ্যমে।

(১৬৮). আল্লাহর কিতাবের তাদাব্বুরের মাধ্যমে বান্দার ঈমান বৃদ্ধি পায়। আল্লাহর দরবারে তার মর্যাদাও বৃদ্ধি পায়। কুরআনের সাথে একজন মুমিনের সম্পর্ক যত গভীর হয়, মজবুত হয়, ততই রবের প্রতি তার ইয়াকীন ও আস্থা বাড়তে থাকে।

(১৬৯). কুরআন তাদাব্বুর করতে হলে, আগে কলবে কিছু বিষয়কে স্থান দিতে হবে: কুরআন কারীমের মহব্বত, তিলাওয়াতের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, আমলের প্রতি দৃঢ় বাসনা। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমার সামনে তার কুরআনি নেয়ামতের ভা-ণ্ডার খুলে দিবেন। কুরআনের রহস্যের দ্বার উন্মোচিত করতে থাকবেন।

(১৭০). তাদাব্বুরের সাথে পড়লে আমরা দেখতে পাব, সূরা কাহফে ফিতনা থেকে বাঁচার চারটা উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। দ্বীনের ফিতনা। মালের ফিতনা। ইলমের ফিতনা। রাজত্বের ফিতনা।

(১৭১). সূরা ক্বফ শুরু হয়েছে:

ق والقرآن المجيد

কাফ, কুরআন মাজীদের কসম!

আর সূরা ক্বফ শেষ হয়েছে:

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد

আমার সতর্কবাণীকে ভয় করে এমন প্রত্যেককে আপনি কুরআনের সাহায্যে উপদেশ দিতে থাকুন!

এই সূরারই এক জায়গায় আছে:

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

নিশ্চয়ই এর ভেতর এমন ব্যক্তির জন্যে উপদেশ রয়েছে, যার আছে অন্তর কিংবা যে মনোযোগ দিয়ে কর্ণপাত করে (৩৭)।

= আমরা উপদেশ গ্রহণ করতে হলে, তাদাব্বুর করতে হবে। কুরআন কারীমের বাণীর অর্থ উদ্ধারে গভীর অনুধ্যান করতে হবে। এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, কুরআন কারীম থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে দু'টি শর্ত:

ক. জীবন্ত উন্মুখ হৃদয়!

খ. জাগ্রত মস্তিষ্ক!

আমাকে মনে রাখতে হবে, আমি যে তেলাওয়াত করছি, তা আল্লাহ তা'আলা খোদ শুনছেন। ইবনে কুতাইবা এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন:

-অর্থাৎ সে আল্লাহর কিতাব শ্রবণ করেছে সজাগ মনোযোগের সাথে, বোঝার সুতীব্র ইচ্ছা নিয়ে, অচেতন গাফেল হয়ে নয়। এ-আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহর কালামকে গুরুত্ব দিয়ে না শুনলে, না পড়লে এর প্রভাব অন্তরে পড়বে না।

(১৭২). কুখ্যাত কুরাইশ নেতা, ওলীদ বিন মুগীরাহ। ঈমান নসীব হয়নি, কিন্তু কুরআনের সমঝদার। কুরআনের বিরোধিতা করতে এসে, কুরআন সম্পর্কে এক অবিস্মরণীয় উক্তি করে গেছে এই লোক:

إن له حلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلا عليه

-কুরআনের মধ্যে রয়েছে অন্য রকমের মিষ্টতা। কুরআনের বাহ্যিক রূপে আছে মনোহারিত্ব-লাবণ্য। কুরআনের উপরিভাগ ফলভারানত নিম্নভাগ পত্রপল্লবশোভিত! কুরআন বিজয়ী হয়, তার উপর জয়ী হওয়া যায় না।

= একজন কাফের হয়ে কুরআনকে এভাবে বুঝল! কুরআনের চমৎকারিত্বকে এভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারল, আমরা মুসলমান হয়ে কী করছি?

(১৭৩). ইসলাম গ্রহণের আগে, জুবাইর ইবনু মুতঈম রা. যখন নবীজি সা.-এর মুখ থেকে কুরআন কারীমের তিলাওয়াত শুনলেন, তখনকার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন:

-আমার হৃদয়টা উড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল **(كاد قلبي أن يطير!)** তিনি কী এমন পেয়েছিলেন কুরআনের মধ্যে, আশায় আনন্দে তার মনটা উড়–উড়– হয়ে গিয়েছিল! অথবা অপার্থিব এক অনুভূতি তার হৃদয়জুড়ে ছেয়ে গিয়েছিল! তিনি (তখনো) একজন কাফের! তা সত্ত্বেও এমন নিখাদ আলোর ঝলক কিভাবে টের পেলেন! আমরা জন্মসূত্রে মুসলমান হয়ে দীর্ঘদিন কুরআনের সাথে জীবনযাপন করার পরও কেন এর ছিঁটেফোঁটা 'ঝলক' টের পাই না!

(১৭৪). জ্বিনেরা কুরআন কারীমকে প্রথম বার শুনেই কিভাবে এর মাহাত্ম্য টের পেয়ে গেলো? স্বগতোক্তি করে উঠলো:

إنّا سمعنا قرآناً عجبا

আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনে এসেছি (জ্বিন)!

আমাদের এমন বোধ জাগে না কেন? আমরা উঠতে বসতেই কুরআন দেখি, কুরআন শুনি তবুও?

(১৭৫). কুরআন তাদাব্বুর বলতে আমরা বুঝি:

ক. কুরআন কারীমের শব্দগুলোর অর্থ বোঝার চেষ্টা করা। এই চেষ্টার ফলে জীবনে আসে এক ইতিবাচক প্রভাব। আচরণে আসে অন্য রকম এক পরিবর্তনের ছোঁয়া।

খ. আল্লাহ তা'আলা আমাকে এই আয়াতে কী বলতে চেয়েছেন, তা বোঝার চেষ্টা করা। আগের ও পরের আয়াতগুলোর সাথে সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করা।

গ. আয়াতে সুসংবাদ থাকলে মনে খুশি খুশি ভাব ফুটিয়ে তোলা। দুঃসংবাদ থাকলে মনে ভীতাবস্থা সৃষ্টি করা। পূর্বেকার জাতিসমূহের ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা।

ঘ. কুরআনের সমস্ত কথাকে মনেপ্রাণে ইয়াকীন করা। সমস্ত আদেশকে মাথা পেতে নেয়া। যাবতীয় নিষেধাজ্ঞাকে মুখ বুজে মেনে নেয়া।

(১৭৬). মুমিন তো তারাই, যাদের সামনে আল্লাহকে স্মরণ করা হলে, তাদের হৃদয় ভীত হয়, যখন তাদের সামনে তাঁর আয়াতসমূহ পড়া হয়, তখন তা তাদের ঈমানের উন্নতি সাধন করে (আনফাল: ২)।

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

যারা তাদাব্বুর করে, কুরআন কারীম দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাদের প্রশংসা করেছেন আল্লাহ তা'আলা।

(১৭৭). কুরআনের তাদাব্বুর ছেড়ে অহংকারের আলামত:

-এরূপ ব্যক্তির সামনে যখন আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন সে দম্ভভরে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতেই পায়নি, যেন তার কান দু'টিতে বধিরতা আছে (লুকমান: ৭)।

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا

শুধু তাদাব্বুরই তারা বর্জন করে না, তাদের কানেও সমস্যা। কুরআনের আয়াত তারা শোনে সত্য কিন্তু কোনও আবেদন সৃষ্টি করে না। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা বধিরতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

(১৭৮). তাদাব্বুর ছেড়ে দেয়ার ভীতিকর দিক হলো, মানুষ নগন্য জড় পদার্থের চেয়েও হীন হয়ে পড়া:

-আমি যদি এ কুরআনকে অবতীর্ণ করতাম কোনও পাহাড়ের উপর, তবে তুমি দেখতে তা আল্লাহর ভয়ে অবনত ও বিদীর্ণ হয়ে গেছে (হাশর ২১)।

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ

বাক-বুদ্ধিহীন একটা পাহাড়ও কুরআনের ভয়ে বেসামাল হয়ে ওঠে! আর আমরা মানুষেরা!

(১৭৯). যাদের উপর তাওরাতের ভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তারা সে ভার বহন করতে পারেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হল গাধা, যে বহু কিতাব বয়ে রেখেছে (জুমু'আ: ৫)।

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً

এ-আয়াতে তাওরাতের কথা বলা হলেও, পরোক্ষভাবে কুরআন কারীমও প্রসঙ্গক্রমে আলোচিত হয়েছে। যারা কুরআন কারীম শুধু মুখস্থ পড়ে, আমল করে না, তারাও গাধার মতো।

(১৮০). খারেজীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো:

يقرؤون القرآن لايجاوزحناجرهم

তারা কুরআন পড়বে সত্য কিন্তু তার শিক্ষা তাদের গলা দিয়ে নামবে না (মুসলিম)।
তারা কুরআনের যথাযথ তাদাব্বুর করে না। কুরআনের হেদায়াত গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়। মনগড়া ব্যখ্যা নিয়েই তারা সন্তুষ্ট।

(১৮১). কুরআন কারীমকে পরিত্যাগ করার শাস্তি ভয়াবহ। স্বয়ং নবীজি এমন লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করেছেন:

يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا

ইয়া রাব! আমার সম্প্রদায় এ কুরআনকে বিলকুল পরিত্যাগ করেছিল (ফুরকান: ৩০)।
পরিত্যাগ করা বলতে, কুরআনের প্রতি ঈমান এনেছে , কুরআন পড়েছে কিন্তু তাদাব্বুর করেনি। নিদেনপক্ষে কুরআন অনুযায়ী আমল করেনি। কুরআনের হালাল-হারাম মেনে চলেনি।

(১৮২). তাদাব্বুর মানে? ইলম অর্জনের জন্যে কুরআন পাঠ করা। ইলম মানে? আল্লাহকে চেনা। তার সম্পর্কে জানা। আল্লাহ সম্পর্কে প্রকৃত ইলম আমাকে ইস্তেগফার-অভিমুখী করে তুলবে।

(১৮৩). আল্লাহর ভয়ই প্রকৃত ইলম। আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকাগ্রস্ত হওয়াই প্রকৃত অজ্ঞতা ।

(ইবনে মাসউদ রা.)।

(১৮৪). তোমরা ইলম হাসিল করতে চাইলে এই কুরআন ঘেঁটে দেখ, কারণ তাতেই আছে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের যাবতীয় ইলম।

(ইবনে মাসউদ)।

(১৮৫). তোমাদের পূর্বে যারা বিগত হয়েছেন, তারা কুরআন কারীমকে মনে করতেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা চিঠি। তারা রাতের আঁধারে কুরআনের তাদাব্বুর করতেন। দিনের আলোতে কুরআনের বাস্তবায়নে নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। তার ইলম অন্বেষণে ব্যপৃত রাখতেন।

(হাসান বিন আলি রা.)।

(১৮৬). তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধর। কুরআন শেখো। তোমাদের সন্তানদেরকে কুরআন শিক্ষা দাও। কারণ তোমাদেরকে এ-ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে। এবং এজন্য তোমাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। জ্ঞানীদের জন্যে উপদেশদাতা হিশেবে কুরআনই যথেষ্ট ।

(ইবনে উমার রা.)।

(১৮৭). আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি আয়াত কেন নাযিল করেছেন, সেটা শিক্ষা দিতে ভালবাসেন। তিনি চান বান্দা প্রতিটি আয়াত পড়ে পড়ে তার উদ্দেশ্য খুঁজে বের করুক।

(হাসান বসরী)।

(১৮৮). তোমরা কুরআনকে আঁকড়ে ধরো। কুরআন হলো রহমানের সর্বশেষ কিতাব। তাতে আছে আকলের নির্যাস, প্রজ্ঞার আলো, যাবতীয় ইলমের উৎস (কা'ব আহবার)।

(১৮৯). আমি কুরআন পাঠ করি। গভীর দৃষ্টিতে আয়াতসমূহের দিকে নজর বুলাই। আমার কাছে অবাক লাগে, কিভাবে কুরআনের হাফেজগন শান্তিতে ঘুমায়?
(একজন সালাফ)।

(১৯০). কুরআনে হাফেজদেরকে দেখলে আমার অবাক লাগে, আল্লাহর কালাম পড়েও কিভাবে তারা দুনিয়াবী বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হতে পারে? তারা যা তিলাওয়াত

করে, তার অর্থ যদি তারা বুঝতো তাহলে এর স্বাদ অনুভব করতে পারতো। মুনাজাতে মজা পেতো। তাকে যে নেয়ামত দেয়া হয়েছে, তার প্রাপ্তির আনন্দে তার ঘুম দূর হয়ে যেতো ।

(একজন সালাফ)।

(১৯১) কুরআন কারীম তিলাওয়াতের সময় যা মনে রাখা চাই:

কুরআন পাঠ করবে আমলের নিয়তে। তুমি কুরআনকে এমন করে পড়ো, কুরআন-পাঠ যেন তোমাকে মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। যদি তোমাকে মন্দ কাজ থেকে বিরত না রাখে তাহলে তুমি প্রকৃত কুরআন-পাঠক নও ।

(হাসান বিন আলি রা.)।

(১৯২). একটা আয়াত নিয়ে তাদাব্বুরের চুড়ান্ত রূপ হলো, সে আনুযায়ী আমল করা, কুরআনের হরফগুলোকে যথাযথভাবে উচ্চারন করলেই তাদাব্বুর হয়ে যায় না।
(হাসান বসরী)।

(১৯৩). হে কুরআনের বাহক! কুরআন কারীম তোমার কলবে কী রোপন করেছে? কারণ কুরআন হলো মুমিনের বসন্ত ঠিক বৃষ্টি যেমন মাটির বসন্ত!

(মালিক বিন দীনার)।

(১৯৪). কুরআন কারীম আল্লাহর কাছে মুনাজাতের নিয়তে পড়া:

তিলাওয়াতকারী পড়ার সময় মনে করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখছেন। তার পড়া শুনছেন। নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাদের কাছে তার প্রশংসা করছেন। তাকে নিয়ে গর্ব করেন।

(১৯৫). তুমি যদি কুরআন কারীম দ্বারা পরিপূর্ণ উপকৃত হতে চাও, তাহলে তিলাওয়াত করা বা তিলাওয়াত শোনার সময় কলবকে পুরোপুরি সুস্থির করে নাও।

তোমার তিলাওয়াত তুমি নিজেই মনোযোগ দিয়ে শোন! আল্লাহর সাথে কথা বলছো এমন তটস্থ ভাব ফুটিয়ে তুলবে।

(ইবনুল কাইয়িম)।

(১৯৬). আল্লাহর যথার্থ মর্যাদাবোধ যদি তোমার কলবে স্থান পেয়ে যায়, তাহলে আল্লাহর কালাম শোনা ও পড়ার চেয়ে অধিক সুস্বাদু সুমিষ্ট সম্মানিত সমুন্নত কোনও কিছু আর হতে পারে না।

(সালাফ)।

(১৯৭). কুরআন কারীম আল্লাহর কালাম। কুরআনের মধ্য দিয়েই আল্লাহ তা'আলা ও তার পরিচয় আমাদের সামনে বিমূর্ত হয়ে ওঠে। এটা হতে পারে কয়েকভাবে:

বড়ত্ব ও ভীতি প্রকাশের মাধ্যমে। ফলে আমাদের হৃদয় বিনয় আর নতজানু হয়। সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা প্রকাশের মাধ্যমে। ফলে তার প্রতি মনটা পরম ভালবাসায় সিক্ত হয়ে পড়ে।

(ইবনুল কাইয়িম)।

(১৯৮). তাদাব্বুরে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে:

সওয়াবের নিয়তে পড়লে ও পড়ালে। নবীজি বলেছেন:

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

যে ব্যক্তি কুরআন কারীম শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়, সে-ই সর্বোত্তম।

(১৯৯). শিফা বা আরোগ্য লাভের নিয়তে কুরআন কারীম পড়া। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

হে মানুষ! তোমাদের কাছে এমন এক জিনিস এসেছে, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক উপদেশ, অন্তরের রোগ-ব্যাধির উপশম এবং মুমিনদের পক্ষে হিদায়াত ও রহমত (ইউনুস: ৫৭)।

(২০০). কিভাবে তাদাব্বুর করব? জোরে স্পষ্ট আওয়াজে সুর করে তিলাওয়াত করার মাধ্যমে।

ليس منّا من لم يتغن بالقرآن يجهر به

যে ব্যক্তি কুরআনকে সুর করে ও জোর আওয়াজে পড়বে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় (বুখারী)।

(২০১). এক লোক সম্পর্কে ইবনে আব্বাসকে বলা হল:

-ওমুক খুব দ্রুত কুরআন তিলাওয়াত করে!

ইবনে আব্বাস সে লোককে বললেন:

-তুমি যদি তিলাওয়াত করতেই চাও, তাহলে এমনভাবে তিলাওয়াত করো, যাতে তুমি তোমার নিজ কানে শুনতে পাও। তোমার হৃদয় দিয়ে যা পড়ছো অনুভব করতে পারো!

(২০২). তুমি যখন তিলাওয়াত করবে, তখন কান খাড়া করে রাখবে। তাহলে পড়াটা কলবে পৌঁছবে। আর কলব হলো কান ও জিহ্বার যোগসূত্র (ইবনে আবি লায়লা)।

(২০৩). তাদাব্বুর হতে পারে: তারতীলের সাথে পড়ার মাধ্যমে। তারতীল মানে, ধীরে ধীরে থেমে থেমে তিলাওয়াত।

আয়েশা রা. বলেছেন:

كان يقرأ السور فيرتلها حتى تكون أطول منها

তিনি (নবীজি) তারতীলের সাথে সূরাগুলো তিলাওয়াত করতেন। আগের সূরার চেয়ে পরের সূরার তারতীল হতো আরো দীর্ঘ সময় নিয়ে (মুসলিম)।

(২০৪). হে বনী আদম! তোমার কলব কিভাবে কুরআন তিলাওয়াতের সময় নরম হবে, তোমার তো লক্ষ্য থাকে কখন সূরা শেষ করবে সেদিকে (হাসান বসরী)।

(২০৫). তাদাব্বুর হতে পারে:

একটা আয়াতকে বারবার পড়ার মাধ্যমে। একবার পড়ার কিছুক্ষণ থেমে ভাবনা চিন্তা করে আবার আয়াতটা পড়ার মাধ্যমে। এভাবে বারবার অসংখ্যবার পড়ার মাধ্যমে। আবু যর রা. বলেছেন:

-আল্লাহর রাসূল নামাযে দাড়ালেন। সুবহে সাদেক পর্যন্ত একটা শুধু একটা আয়াতই বারবার পড়লেন! আয়াতটা ছিল:

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা তো আপনারই বান্দা আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে নিশ্চয়ই আপনার ক্ষমতাও পরিপূর্ণ এবং হিকমতে পরিপূর্ণ (মায়িদা: ১১৮)।

(২০৬). হাসান বসরি রহ. একবার সারারাত ধরে একটা আয়াতই বারবার পড়েছেন:

وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

তোমরা যদি আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গুণতে শুরু কর, তবে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (নাহল: ১৮)।

তার কাছে জানতে চাওয়া হল:

-এই আয়াত কেন?

-চোখ তুলে যেদিকেই তাকাই, শুধু নেয়ামত আর নেয়ামত! জানি না, দৃষ্টির আড়ালে আরও কত নেয়ামত লুকিয়ে আছে!

(২০৭). সারারাত দ্রুত পড়ে কুরআন খতমকরার চেয়ে, সূরা যিলযাল ও কারি'আ বারবার তাদাব্বুর করে করে পড়া আমার কাছে অধিক প্রিয় (ইমাম কুরতুবী)।

(২০৮). একটা আয়াত বারবার পড়ার মধ্যে অনেক উপকারিতা:

সালাফের অনুসরণ করা হবে। তারা এভাবে একটা আয়াতকে বারবার করে পড়তেন।
বারবার পড়লে তাদাব্বুর করতে সুবিধা হয়। বুঝটা গভীর হয়। প্রথমবার না বুঝলে দ্বিতীয়বারে বোঝা যাবে। নইলে তৃতীয়বারে, নইলে চতুর্থবারে! প্রতিবারেই কিছু না কিছু বুঝ বাড়তেই থাকবে!

বারবার পড়লে, আত্মার শুদ্ধি হবে। ময়লা থাকলে দূর হয়ে যাবে। ঈমান বৃদ্ধি পাবে। কুরআনের স্বাদ অনুভব হবে। কারণ বারবার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে 'গাফলত' দূর হয়। গাফেল কলবে কুরআন প্রবেশ করে না।

একটা আয়াতকে যতবার পড়বো, ততই আল্লাহর পক্ষ থেকে কিছু না কিছু ‘হেদায়াতের’ নেয়ামত আমার উপর বর্ষিত হতে থাকবে। ঈমানের নবতর কলি প্রস্ফুটিত হতে থাকবে।

(২০৯). তাদাব্বুর হতে পারে:

আয়াতটাকে কোনও ভাবে সীরাতের সাথে সম্পৃক্ত করা যায় কি না, দেখা। সীরাত পাঠের মাধ্যমে কুরআনের আয়াতগুলো অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কুরআন বোঝার জন্যে সীরাতপাঠ অপরিহার্য।

(২১০). তাদাব্বুর হতে পারে:

তিলাওয়াতের সাথে সাথে সাড়া দেয়া। আয়াতে যা বলা হয়েছে তা তৎক্ষণাত করা। নবীজি সা. অত্যন্ত ধীরে ধীরে তিলাওয়াত করতেন। আয়াদের দাবী পূরণ করে করে সামনে বাড়তেন। তাসবীহের আয়াত এলে, তাসবীহ পাঠ করে নিতেন। প্রার্থনার আয়াত এলে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে নিতেন। পানাহ চাওয়ার আয়াত এলে, আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়ে নিতেন।

(২১১). তাদাব্বুর হতে পারে:

কুরআন পাঠের সময় শোকের কথা মনে করে, কান্নার ভান করা। আয়াতের অর্থের সাথে সাথে গলার স্বরও ওঠানামা করানো। আয়াতের আবেগ যেন গলায় ফুটে ওঠে। প্রতিটি আয়াত পড়ার সময় খেয়াল করা, আমি এখন কোন ধরনের আয়াত পড়ছি, হাসির? কান্নার? আনন্দের? বেদনার? চাওয়ার ? পাওয়ার? ভয়ের? আশার? চিন্তার? দুশ্চিন্তার? জান্নাতের? জাহান্নামের? আমলের? আদেশের? নিষেধের?

(২১২). কুরআন পাঠের সময় কান্না হলো বিনয় প্রকাশের মাধ্যম। এটা আল্লাহভিমুখী বান্দাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কান্না আনার একটা উপায় হলো: সামনে জাহান্নামের ভয়াবহ অবস্থার কথা কল্পনা করা। কবরের ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা ভাবনায় আনা। সে তুলনায় আমার নগন্য আমল ও স্বল্প প্রস্তুতির কথা ভাবা।

(২১৩). তাদাব্বুর হতে পারে:

পড়ার সময় খেয়াল করা, কুরআন কারীমের প্রতিটি আয়াতের লক্ষ্য আমি নিজেই। ইমাম কুরতুবি বলেছেন:

-যার কাছে কুরআন পৌঁছল, তার সাথে যেন আল্লাহ স্বয়ং কথা বললেন।

(২১৪). উরওয়া বিন যোবায়ের বলেন:

-আমি দাদু (আসমা রা.)-এর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, সাহাবীগন কুরআন তিলাওয়াত শুনলে কেমন হতো তাদের অবস্থা?

-ঠিক যেমনটা কুরআন কারীম বলেছে: **(تدمع عيونهم وتقشعر جلودهم)** তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতো। তারা প্রকম্পিত হয়ে উঠত!

তিনি দু'টি আয়াতের দিকে ইশারা করেছিলেন:

প্রথম আয়াত: এবং রাসূলের প্রতি যে কালাম নাযিল হয়েছে তারা যখন তা শোনে, তখন তারা যেহেতু সত্য চিনে ফেলেছে, সেহেতু তাদের চোখসমূহকে দেখবে যে, তা থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে (মায়িদা: ৮৩)।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ

দ্বিতীয় আয়াত: আল্লাহ নাযিল করেছেন উত্তম বাণী-এমন এক কিতাব যার বিষয়বস্তুসমূহ পরস্পর সুসমঞ্জস, যার বক্তব্যসমূহ বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যাদের অন্তরে তাদের প্রতিপালকের ভয় আছে, তারা এর দ্বারা প্রকম্পিত হয়। তারপর তাদের দেহ-মন বিগলিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে (যুমার: ২৩)।

(২১৫). আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রহ. বলেন:

-আমি ফজরের নামাজের সময় ছিল শেষ কাতারে। সেখান থেকেই উমার রা.-এর ফোঁপানোর আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। তিনি সূরা ইউসুফ তিলাওয়াত করছিলেন নামাজে। পড়তে পড়তে:

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ

ইয়াকুব বলল, আমি আমার দুঃখ ও বেদনার অভিযোগ (তোমাদের কাছে নয়) কেবল আল্লাহরই কাছে করছি (ইউসুফ: ৮৬)।

পর্যন্ত পৌঁছলেন। আর কান্না ধরে রাখতে পারলেন না।

(২১৬). আবদুল্লাহ ইবনে উমার রা. সূরা মুতাফফিফীন পড়তে পড়তে:

يوم يقوم الناس لرب العالمين

যে দিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে (৬)।

পর্যন্ত পৌঁছলেন। আর সামনে বাড়তে পারলেন না। কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

আমি কুরআন কারীম তিলাওয়াত করার সময় কী করি? কখনো কেঁদেছি?

হেসেছি? মন খারাপ করেছি? আয়াতের প্রভাবে?

তাদাব্বুর নিয়ে যা বলার ছিল, তার চারভাগের একভাগ মাত্র বলতে পেরেছি। আলহামদুলিল্লাহ! বাকী কথার জন্যে আরো মেহনত লাগবে। ইনশাআল্লাহ!

সংগ্রহীত

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৩৪৬৫

হে প্রিয়বন্ধু তোমাকেই বলছি! (তিন)

HELLO MY FRIENDS

Junior Member

০২-০৬-২০১৯

আগেই একটি বিষয় বলে রাখি। আমি কোনো কাল্পনিক ব্যক্তি নই। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বাস্তবতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। কানে কানে কিছু বলতে খুব অপছন্দ করি। তাই আজ আরো একটি বাস্তবতা তোমার সামনে তুলে ধরি! আচ্ছা বল তো বন্ধু! ব্যক্তিগত মূল্যবোধ বলতে তুমি কি বুঝ? তুমি কীভাবেই বা নিজেকে মূল্যায়ন কর?

আপনি যেহেতো একটি কিছু বলতে চাচ্ছেন তো আপনিই বলুন! আমি শুনি। আপনার অভিমতটি শুনতে তো কোনো বাধা নেই। ও তাই নাকি! ঠিক আছে।

শোনো আব্দুল্লাহ! এ ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোনো অভিমত নেই তারপরও যেটুকু বলছি এর পুরোটাই আমার একান্ত আন্তরিক বিশ্বাস, তাই সেটিকে তুমি হুট করেই আমার ধর্মীয় বিশ্বাস বলতে যেও না। কারণ সেখানে নাতিদীর্ঘ আলোচনার যথেষ্ট পরিমার অবকাশ রয়েছে। এখানে আর একটি কথাও বলব না, অন্যথায় আলোচনা ভিন্নদিকে মোঁড় নিবে। এখন এসো ফিরে যাই ব্যক্তিগত মূল্যবোধের পরিচয়ের দিকে। ব্যক্তিগত মূল্যবোধের পরিচয়টি যদি অতি সহজেই আমি তোমাকে বুঝাতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে এ কথাই বলব যে, তোমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধের অর্থ হল, তোমার তিনটি কাজ করা। অর্থ্যাৎ তোমার জীবনকে তিনটি দিক দিয়ে সফলতা মণ্ডিত করা। সে সফলতার জন্য যে প্রক্রিয়া-পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রয়োজন সাধ্যমত সেটিই গ্রহণ করা।

প্রথমত: হৃদয়ের দাবিগুলোকে মূল্যায়ন করা। সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করে হলেও হৃদয়কে প্রশান্তিতে রাখার চেষ্টা করা।

দ্বিতীয়ত: পারিবারিকভাবেও নিজের মূল্যবোধ অটুট রাখা। পরিবারের মাঝেও নিজেকে আরামদায়ক অবস্থানে রাখা।

তৃতীয়ত: সামাজিকভাবেও নিজেকে শান্তিতে রাখার জন্য নিজেকে শান্তিপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া।

তবে তোমার সাথে আজ আমার বুঝ পরামর্শ হলো প্রথমটি নিয়ে। কারণ তুমি জানো ও বিশ্বাস কর দিত্বীয় ও তৃতীয়টি যদিও স্বাতন্ত্র দুটিভাগে বিভক্ত হয়েছে। কিন্তু এ দুটো মূলত প্রথমটিরই শাখা বিশেষ। তারপরও গুরুত্বের দিক বিবেচনা করা হলে কোনোটিই কিন্তু অপরটির চেয়ে খাটো নয়। এখন এসো প্রথমটি নিয়ে আলোচনা করি। এজন্য সরাসরি 'বিশ্ব-শান্তি ও ইসলাম' গ্রন্থের কিছু বিষয় তোমার সামনে তুলে ধরছি।

"ব্যক্তি-মন যেখানে শান্তি উপভোগ করতে পারে না, সেখানে কোনো শান্তি নেই। শান্তি সম্পর্কে এটিই ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী। যখন সুদৃঢ়ভিত্তির উপর শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয়, সর্বপ্রথম তা হৃদয়ের গভীরে প্রতিষ্ঠা করতে হয়"। "আবেগ-অনুভূতি আর হৃদয়ের মৌলিক আশা-আকাঙ্খার সুবিন্যাসের ফলে শান্তির অস্তিত্ব লাভ হয়; জোর-জবরদস্তী, বলপ্রয়োগ ছল-চাতুরি আর কলা-কৌশলের ফলে নয়। আর হৃদয়ের এ শান্তি ব্যক্তির অস্তিত্ব, আবেগ-অনুভূতি ও আশা-আকাঙ্খার মর্যাদা দেয়"।

আব্দুল্লাহ! তুমি জানতে পারলে একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত মূল্যবোধ তখনই রক্ষা করতে পারে, যখন সে ব্যক্তি নিজ হৃদয়কে সার্বিকভাবে প্রশান্তিতে রাখতে সক্ষম হয়। হৃদয়ের হাতজোর দাবিগুলো যদি কি না সে ব্যক্তি পূর্ণ করতে সফল হয়। তবে তখন একটি বিষয়ের প্রতি তোমাকে খুব খেয়াল রাখতে হবে, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ধরতে গিয়ে, তুমি কোনো কুপ্রবৃত্তির পেছনে পড়ছ না তো? এর বৈধ পথসমূহ ছেড়ে কোনো অবৈধ পথ বেঁচে নিচ্ছো না তো? যদি এসব দিকগুলোর সবকটিই তুমি ঠিকঠাক রাখতে পার, তবেই মনে করবে যে, তুমি সঠিক পথে আছ। তোমার ব্যক্তিগত মূল্যবোধকে রক্ষা করতে পারছ। তখন তুমি আশা করতে পার, 'অচিরেই তুমি সফলতার মুখ দেখবে'।

আব্দুল্লাহ! এখন এসো আমাদের বন্ধুত্বের দিকে। আমরা দেখব আমাদের সত্যিকার বন্ধুত্ব সত্যই আমাদের ব্যক্তিগত মূল্যবোধের পর্যায় পরে কিনা? জীবনকে আলোকিত করতে হলে যে ভালোবাসা-বন্ধুত্বের মূল্যায়ন আমাদের জন্য অনেক অনেক জরুরি।

আব্দুল্লাহ! আমার মনে হয় এটি তোমাকে আমার বুঝাতে হবে না যে, ভালোবাসা-বন্ধুত্বের প্রয়োজন তুমি সর্বদায় অনুভব করছ, যেমনই কাউকে না কাউকে বন্ধু বলে ভালোবেসেই যাচ্ছ। শুধু আমাকে বন্ধু বলে ভালোবাসতেই তো একটু হিমশিম খাচ্ছ; কিংবা সত্যিকার ভালোবাসা-বন্ধুত্ব বুঝতে হয়তো ভুল করছ। যাক! এখন আমি তোমার সে ভালোবাসা লুফে-লুটে নিতে চাই না। জানোই তো ভালোবাসা হাতিয়ে নেওয়ার কিছু নয়। কারণ তা হলো এক প্রকার হৃদয়ের প্রশান্তি, যা লোষ্ঠনের জিনিস নয়। ভালোবাসা-বন্ধুত্ব কোনো সরকারি সম্পদও নয়, যা তুমি যথেচ্ছায় বিতরণ কর এবং অবশেষে রয়ে যাওয়া একটি বিরাট অংশ, এ বলে দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও, 'সারকারি মাল দরিয়া ম্য ঢাল'। কারণ দেখ, তুমি আমাকে ভালো না বাসলেও কিন্তু আমি তোমাকে ভালো বেসেই যাব। শোনো! তোমার ভালোবাসায় আমি সততার পরিচয় দিতে গিয়ে তোমাকে আমার পাশে থাকতে হবে না। তোমার ভালোবাসাকে সংরক্ষণ করতেও আমাকে কোনো ধরনের বেগ পেতে হবে না। জানোই তো, আমার হৃদয় তোমার ভালোবাসাকে আগলে রাখতে সর্বদায় প্রস্তুত। তাতে তোমার ভালোবাসা সংরক্ষণ করতে যথেষ্ট পরিমান জায়গাও আছে। বেশ নিরাপদ জায়গাই। তেমন কোনো কিছুর ভয় নেই। আর সেখানে তা পঁচবেও না।

আব্দুল্লাহ! হয়তো তুমি অনেককেই ভালোবাস, ভাল কথা। 'আরে বাবা'এ জন্য আমার কোনো আক্ষেপ নেই। আমি ঈর্ষাণ্বীতও নই। শোনো! আমি আক্ষেপ করছি শুধু এজন্যই যে, "তুমি সত্যিকার কোনো বন্ধু পেয়েছ কিনা? তারা তোমার সাথে ভালো ব্যবহার করছে কিনা? শুধু শুধুই তারা তোমার সময় নষ্ট করছে না তো? শোনো! আজ কিন্তু আমার অবস্থা মোটামুটি ভালোই গিয়েছে। এই তো, সে দিনও তোমার কথা মনে হলে ভেতরটা কেমন যেন করত। কষ্টের; অতিশয্যায় হৃদয় আমার তোমায় শুধু ডাকত!! কিন্তু আজকের অবস্থা অনেক ভালোই গিয়েছে। মনে রেখ! সত্যিকার ভালোবাসা-বন্ধুত্বে কোনো নিরাশা নেই। আমার বিশ্বাস সত্যিকার ভালোবাসা-বন্ধুত্বের ফল একটু দেরিতেই ফলে। তবে যখন আসে স্থায়ীভাবেই আসে, তেমন কোনো সময় ধরে নয়। শোনো! আমি যদি অবিচল থাকি, তবে তুমি ছাড়া অনেকেই আমাকে ভালোবাসবে। বন্ধু বলে কাছে টেনে নিবে। তথাপিও কেউ কেউ হয়তো একটু কটাক্ষও করবে। করুক তাতে আমার কি আসে যায় বরং এতে আমি আরো বেশি আনন্দিতই হবো। কারণ তখন আমি পরিষ্কার বুঝতে পারব, এ

পৃথিবীতে আমিই সত্যিকার ভালোবাসা-বন্ধুত্বের জয়তন্ত্রী। এটি খুশির বিষয়। আর অনেকেই হয়তো তখন আমাকে পাগল বলবে, তাতেও আমি বেজার নই। কারণ আমি জানি সত্যই যে পাগল তাকে কটাক্ষ করে কেউ পাগল বলে না। সুস্থ মানুষকেই কটাক্ষ করে পাগল বলে ডাকা হয়। তাহলে অর্থ দাঁড়ায়, আমি সুস্থ কিন্তু ওরা আমাকে এজন্যই পাগল বলছে যেন এখন আমি তাদের কথায় অতিকষ্টের ধরুণ পাগল হয়ে যাই।

শোনো! এখন হয়তো অনেক নির্বোধ বন্ধু আমার ব্যাপারে তোমার কাছে অনেক কিছুই বলবে। কিংবা চিঠি পাঠিয়ে আমার অনেক কিছুই তোমাকে জানাবে। ঠিক আছে, তারা বলতে পারে আর তোমারও যেহেতু কান আছে, তুমিও তাদের কথা শুনতে পার। আমিও তোমায় দুটো কথা বলে রাখি। শোনো! তারা ভালোবাসার মাপকাটিতে অবশ্যই চরম ভুলকারী। পবিত্র ভালোবাসাকে তারাই তো আজ কলুষিত করছেন। সত্যিকার বন্ধুর চেহারায় তারাই তো আজ কলঙ্কের কালিমা লাগিয়ে দিচ্ছেন। ভালোবাসা-বন্ধুত্বের মৌলিক নীতিমালায় প্রতিনিয়তই মনমত পরিবর্তন আনছেন। তাই তো তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে, তারা ভালোবাসার 'ভ' র শুদ্ধ উচ্চারণটিও হয়তো করতে পারবে না, তবুও ভালোবাসা ভালোবাসা খৈ সর্দায় তাদের হাড়িতে (মুখে) ফুটতে থাকে। তারা কীভাবে যে; কীভাবে যে; ভালোবাসে তা বলতেও লজ্জা করে। আরে জানো না?

(.....)

আমার মন বলছে, তুমি জানতে চাচ্ছ কেন আমি বার বার 'ভালোবাসা ভালোবাসা' জিগির জপছি? শোনো! আমার দৃষ্টিতে একজনকে আগে ভালোবাসতে হয়, অতপর জীবনপথের পাথেয় হিসেবে বন্ধু বলে বরণ করে নিতে হয়। জীবন নামক সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের জন্যে একনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কুঁড়িয়ে নিতে হয়। ন্যায়-নীতির আদর্শ ইসলামকে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তোমার বন্ধুত্ব যে আমার একান্তই প্রয়োজন, তুমি কি তা জানো? শোন! সত্যিকার বন্ধুত্বের বাহুবলই এ পৃথিবীকে সোনালী যুগ উপহার দিয়েছিল। সত্যিকার বন্ধুর বন্ধত্বই দুর্গম গীরি, কান্তার মরূ, আর অথই দরিয়া তীরে এ দ্বীনের মুজাহিদদের একাকিত্ব দূর করেছিল। তাহলে বুঝতে পারলে, কিছু না ভেবে আগেই বন্ধুত্ব নয় বরং আগে ভালোবাসা তারপর বন্ধুত্ব। আর তাই আমি 'আল কায়দা তোমার জন্যে আন্তরিক ভালোবাসা-বন্ধুত্ব নিয়ে আজও অপেক্ষমান। আগামী কালও তোমার বন্ধুত্বের

জন্যে তোমারি পথপানে আগুয়ান। তোমার আমৃত্যুই তোমার জন্যে জিহাদের ময়দানে দন্ডায়মান। এসো বন্ধু চলে এসো। দুজাহানের সফলতা ও মুক্তির তরে জিহাদের পথে চলে এসো!

যেদিন আরশের ছাঁয়া ছাড়া আর কোনো ছাঁয়া থাকবে না সেদিন আল্লাহ তায়ালা সাত শ্রেণীর লোককে আরশের নিচে ছাঁয়া দিবেন তাদের একটি শ্রেণী হলো ঐ দুই ব্যক্তি যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে একে অপরকে মহাব্বৎ করতো। আর এজন্যে তারা মাঝে মধ্যে একত্রিত হত আবার পৃথক হয়ে যেত। (বুখারী, মুসলিম)

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১২৩১০

কুরআন: কখনও ভেবে দেখেছি?

alihasan

Member

০৯-১৭-২০১৯

কুরআন: কখনও ভেবে দেখেছি?

চারটি দৃশ্য কল্পনা করি।এই দৃশ্যগুলোর "মানে" টাও বোঝার চেষ্টা করি।

[এক]

আমি নিজের গন্তব্যে হেঁটে চলছি।স্বাভাবিক গতিতেই হাঁটছি।

- বোঝা যায়, এ অবস্থায় আমার তেমন কোনো তাড়া নেই। কোনো রকম পৌঁছতে পারলে চলবে।

[দুই]

কিছুটা জোর কদমে এগোচ্ছি।একটু পর পর দৌড় দিচ্ছি।

- বোঝা যায়, এ অবস্থায় আমি আরেকটু সিরিয়াস। সময়ক্ষেপণ হলেই কিছু একটা হারানোর আশংকা আছে।

[তিন]

দৌড়াচ্ছি।আবার আশেপাশে যারা দৌড়রত আছে, সবার দিকে নজর রাখছি।আমি যেন কারও থেকে পিছিয়ে না থাকি,সে জন্যে সতর্ক আছি।

- বোঝা যায়, এ অবস্থায় আমার উদ্বেগের মাত্রা একটু বেশি। সামনেই অতি মূল্যবান

কিছু অপেক্ষা করছে, যা হাতছাড়া করতে রাজি নই।তাই পাল্লা দিয়ে দোড়ে যাচ্ছি লক্ষ্যপানে।

[চার]

রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যাচ্ছি। আশেপাশে কারও দিকে তাকানোর বিরাম নেই, সামনে বা পেছনে নজর দেওয়ার ফুরসতও নেই। প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটেই চলছি।

- বোঝা যায়, জীবন ও মৃত্যুর ভাবনা-রেখা এক বিন্দুতে মিলে গেছে। যেদিকে ছুটছি,সেদিকটা ছাড়া আর কোথাও আশ্রয়ের সম্ভাবনা নেই। আশ্রয়স্থলে পৌছতে এক মুহূর্ত বিলম্ব করাও বিপদ!

পৌঁছে গেলেই আমি নিরাপদ।

এবার কুরআনের কাছে আসি।প্রিয়তম রব্ব-এর চারটি আদেশ খেয়াল করি। চারটি আদেশ প্রদানে চার ধরনের শব্দচয়ন লক্ষ করি।

[১]

আল্লাহ আমাদেরকে রিযক অন্বেষণের আদেশ দিয়েছেন। রিযক অন্বেষণের জন্যে আমাদেরকে বলেছেন: **فامشوا** 'হেঁটে যাও'(আল-মুলক-১৫)

[২]

জুমুআর দিন আযান শোনার সাথে সাথে সবধরনের কাজ বন্ধ করে সালাতের দিকে মনোনিবেশের আদেশ দিয়েছেন। এই আদেশের সময় বলেছেন **فاسعوا**'দৌড়াও'(জুমুআহ-৯(

[৩]

জান্নাত লাভের জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে প্রণোদনা দিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন। জান্নাতের দিকে কিভাবে যেতে বলেছেন? বলেছেন **وسارعوا** ' তোমরা পাল্লা দিয়ে দৌড়ে যাও'।(আলে ইমরান-১৩৩)

[৪]

এবার আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে কী বলেছেন, দেখুন। **ففروا إلي الله** 'অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ছুটে চল'(আয-যারিয়াত- ৫০)

আগের চারটি দৃশ্যের সাথে এই চারটি শব্দ-কে মিলিয়ে দেখি।

কী বুঝলাম?

রিযক অন্বেষণের জন্যে হেঁটে গেলেই যথেষ্ট। পৃথিবীতে জীবনধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় কিছু উপকরণ সংগ্রহ করার জন্যে এত তাড়া নেই, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠারও কিছু নেই।

সালাতের দিকে মনোনিবেশ করার জন্যে আরেকটু বেশি গতিময় হওয়া চাই।বিলম্ব হলেই বিড়ম্বনা। পূণ্যের খাতায় শূন্য উঠতে পারে।

জান্নাতের জন্যে আরও বেশি উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন আছে। জান্নাত অভিমুখে এগিয়ে যাওয়া অভিযাত্রীদের সাথে নিজের গতির তুলনা করারও দরকার আছে। খানিকটা পিছিয়ে গেলেই অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার সংকল্প থাকা নেহায়েত জরুরি।

আল্লাহর দিকে? সেভাবেই ছুটে যেতে হবে, জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে যেভাবে ভয়ার্ত মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছোটে।**فرار** এমন এক অর্থের প্রতিনিধিত্ব করে, যা চূড়ান্ত পরিণতি থেকে পরিত্রাণের জন্যে উদ্বেগাকুল ছোটাছুটি'র দ্যোতনা-কে প্রকাশ করে। ভয় থেকে নিরাপত্তার দিকে ছুটে যাওয়া, নিশ্চিত মরণ থেকে নিশ্চিত শরণের দিকে ছুটে যাওয়া।

পেছনে ধাবমান কোনো নেকড়ের অস্তিত্ব যখন টের পাবো,তখন তার থাবা থেকে বাঁচার জন্যে আমি এক মুহূর্তও এদিক-সেদিক না ভেবে প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটে যাবো।ঠিক সেভাবেই শয়তানের ওয়াসওয়াসা আমার ভিতরে অনুভূত হওয়ার সাথে সাথেই আমি প্রাণভয়ে শঙ্কিত হবো,প্রাণ হাতে নিয়ে আল্লাহর কাছেই ছুটে যাবো।

নাফসের চাবুকাঘাতে প্রাণের প্রাণনা ওষ্ঠাগত হয়ে গেলেও আমার হতাশা নেই ;কারণ, এই মুহুর্তেই আমি আমার শেষ ভরসাস্থল আল্লাহর দিকে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে যাবো।

পোস্ট লিংক: https://৮২.২২১.১৩৯.২১৭/showthread.php?১৪২১৫

*****